আনন্দ গানে রে...

প্রাগৈতিহাসিক যৌথ উল্লাসের পথ ধরে অবশেষে 'মা' হয়ে গেলাম। সারারাতের কষ্ট - প্রতীক্ষার পর ভোর ৫টায় আমাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। মেয়ে সন্তান, দুজনে বাজি ধরেছিলাম, এ কারণে আলট্রাসনোগ্রাম করা হয়নি। জ্ঞান ফেরার পর যখন শুনলাম মেয়ে হয়েছে, তখন ঘরভর্তি মানুষ এবং ডাক্তার-নার্সদের সামনেই চিৎকার উঠলাম, 'ফাহিম, দোস্ত, আমি জিতে গেছি।'

সবার কুবতর উড়ানো হাসির হররায় বুঝতে পারলাম, এতদিন যা করেছি, করেছি- কিন্তু মেয়ের সামনে তার বাবাকে 'দোস্ত, তুই' বলে আর সম্বোধর করা শোভন নয়।

ঘর একটু ফাঁকা হতে জানালা দিয়ে কেবিনের বাইরে তাকাতেই মনে হলো, এতদিন আমাদের রূঢ় কথা শুনে দূরে সরেছিল যে নীলাকাশ সে তার সবটুকু নীল দিয়ে এই নব আগন্তুককে স্বাগত জানাচ্ছে, দিচ্ছে আশ্বাস। পৃথিবীর তাবত শুভ যেন আমার জন্য, আমার কন্যার জন্য হচ্ছে প্রকাশ।

শরৎ। শুভ্র শরতের কোমল ছোঁয়ায় হয়তো কাশফুলেরা শিউরে উঠছে, সেই শিহরণ কি আমার প্রাপ্তির চেয়েও মনোহর! এই ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপের দেশে কতটুকু নিরাপত্তা আমার মেয়েকে দিতে পারব জানি না। সব আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে এ শরতে মনে বাজছে বিয়ে বাড়ির সেই ব্যাকুল নহবতের মতো একটি গান।

শরতে আজ কোন অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে,
আনন্দ গান গা রে হৃদয় আনন্দ গান গা রে... (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

➢ প্রথম আলো, পাঠক ফিচার বন্ধুসভা
বিষয় : মনেতে শরৎ এল গুনগুনিয়ে
সেরা ফিচার
১১ অক্টোবর, ২০০০.

শীতচক্র

- ১৯৯৭ : সময় কোমল। মানুষের দুঃখে প্রাণ কাঁদে। তাই শীতবস্ত্র সংগ্রহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। স্থান লালমনিরহাট। কাজ শেষ করে ফিরি সবাই। রেকর্ড সাতদিন গোসল না করার।
- ১৯৯৮ : বাস্তবতা অনেক কঠিন। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাল নেই। টাকা দিয়ে নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার চেষ্টা অব্যাহত। উত্তরাঞ্চলের মানুষের জন্য এক সংগঠনে টাকা দিয়ে খালাস।
- ১৯৯৯ : বন্ধুর লাশ তাও যদি ২২ বছরের যুবকের হয় এবং মৃত্যুর কারণ হয় রোড এক্সিডেন্ট, তাহলে অন্যরকম এক শীত ভারী চাদরের মতো কাঁধে ভর করে। সেই চাদর উষ্ণতা দেয় না, দেয় আর্দ্রতা। বারডেমের হিমঘরে মৃত বন্ধুর শৈত্যপ্রহর যেন কম প্রলম্বিত হয়, সেই চেষ্টাতেই ওই শীতটা শেষ!
- ২০০০ : অস্তিত্বের শেকড়ে টান। কেবল ছুটে চলা। ডাকসুর সামনে শীতবস্ত্র সংগ্রহের তোড়জোড় দেখে চমকে তাকাই গাছেদের দিকে- সন্তর্পণে জানতে চাই কবে গাইলে পাতা ঝরিয়ে, কাঙাল হওয়ার গান?

➢ প্রথম আলো, পাঠক ফিচার বন্ধুসভা
বিষয় : শীতের সুখপাখি
সেরা ফিচার
২৪ জানুয়ারী, ২০০১.

বুকের জমিন জুড়ে শুধু বন্ধুদের বসতবাটি

শ্রমাগারে শ্রান্তির স্বেদ ঝরেই চলে। আঙ্গুলের কড় গুনে দিনের হিসাব, ওই তো আর দু'দিন, তারপর শুক্রবার। সবেধন, ছুটির ঘণ্টা। প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জনের উদ্বাহু দৌড়ে যোগাযোগ কমে,ছানিপড়া ক্ষীণ দৃষ্টির মতোই বন্ধুদের দেয় সময়ের বিয়োগ ঘটমান বর্তমান হতেই থাকে। অথচ একটা সময় ছিল, বুকের জমিন জুড়ে শুধু বন্ধুদের বসতবাটি; ঘনিষ্ঠতার ব্যারোমিটারে কেউ একতলা বাড়ির অধিকারী, কেউবা সাতমহলা নহবতখানার বাসিন্দা। ছুটে ছুটে আড্ডা- ঝুম বৃষ্টি ধুম জমায়েত। শরৎ কেটে যায় পাবলিক লাইব্রেরীর সীমানায়। যোগাড়যন্ত্র- আজ কবির বাসায় গজল্লা।

একটু বসার জায়গার অভাবে মিরপুর থেকে টিএসসি... টাকা পাওয়া গেল! - মাইক্রো । যৌবন আসে ফের চলে যায়, মনে হয় আমাদের যাবে না। মেঘনার জল ছুঁয়ে বন্ধু-বান্ধবীরা বলি- 'দেখিস, আমরা আগামী বছর আবার...।' সেই বছর আর ঘুরে আসে না। সবার নিত্যদিনের রুটিন মেলে না, ছুটির দিন-তারিখ ছক মেলানো হয় না। বেড়ে যেতে থাকে বিলম্বিত অদেখার দূরত্ব। জীবিকার উল্লম্ফন, তাগিদে 'আমার জন্য আমি বাঁচতেই থাকি'।

জায়গার অভাব ঘুচে গেছে, আড্ডার এখন অনেক স্থান; বন্ধুদের-বান্ধবীদের যৌথ জীবনের সুখী গৃহকোণ-ওসব বাসায় অনায়াসেই জমিয়ে দেয়া যায় 'মেহফিল'। কিন্তু আমাদের শান্ত-উচ্ছৃঙ্খল-অগোছালো-পরিপাটি ছায়াগুলো চলে গেছে অন্য কোন নব তারুণ্যের খোঁজে। মনের খোল - নলচেতে বন্ধুহীনতার জং ধরে যায় জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে। অন্যরা বলে উঠবে - তোর কেবল হা-হুতাশ, সময় তো বদলায়-বদলায় মন। আমার যে সিগারেট পোড়ানো, ধোঁয়া ছড়ানো চা-স্বাদের দিন আবার ফিরে পেতে মন চায়, ইচ্ছা করে ফের চালাতে লুঠতরাজের হল্লা। তোরা তো জানিস সঙ্গবিঘ্ন পাখির উচাটন। তবে কেন ফিরিস না? আমার যে আর দি কাটে না এক আকাশে একলা ধেয়ে, পথ চেয়ে। অভিমানের ঝাড়লণ্ঠন, ঊর্মিরোল পেরিয়ে আয়, একসঙ্গে উঠবো গেয়ে... সকাল, দুপুর/বন্ধুর জন্যে বহুদূর।

➢ যুগান্তর, স্বজন সমাবেশ
বিষয় : বিশ্ব বন্ধু দিবস
ফিচার
৩১ জুলাই, ২০০২.

জোয়ান অফ বাংলাদেশ

ভুলে যাওয়ার খেলায় আমাদের জুড়ি মেলা ভার। কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান এসব তো তথাকথিত আধুনিকতার বিমাতা। কোন কিছুর আশা না করে যে দান তা তো 'সম্প্রদান'। তেমন এক দাত্রীর কথা বলব যিনি সুরে সুরে ধারণ করেছেন 'একাত্তরের বাংলাদেশ'।
'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' গানের সৃষ্টি কোন আকস্মিক ঘটনা জোয়ান বায়েজের জন্যে ছিল না। মাত্র দশ বছর বয়স থেকে জোয়ান ভেবেছেন মানুষ মানুষের মনের জমিনে যে ক্ষত তৈরী করে তা থেকে কিভাবে তাকে নিবৃত্ত করা যায়।
একাত্তর সালে তারুণ্যের পূর্ণ সূর্য জোয়ানের আকাশে, বয়স মাত্র ত্রিশ। সেই সময় আর দশজনের মতো প্রাত্যহিকতার স্বপ্নে গা না ভাসিয়ে তিনি সমকালীন সমস্যা থেকে মুক্ত হবার স্বপ্ন দেখেছেন অনায়াসে। আমেরিকার নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ভোগবাদী উন্নত বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব তাঁকে পীড়িত করেছে নিঃসন্দেহে। তাই ১৯৭১-এ ২৫শে মার্চ রাতের ভয়াবহতার কথা শুনে তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করতে সময় নেন না মোটেই। শিল্পকে মাধ্যম করেই এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে হবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হতভাগ্য ছাত্রদের মৃত্যুকে প্রকাশ করতে হবে গানে গানেই। অস্ত্র নয়; হাতে তুলে নিলেন প্রিয় গীটার, লিখলেন, সুর করলেন নতুন গান -'বাংলাদেশের গান' (The Song of Bangladesh) । যুদ্ধবিরোধী অন্যান্য সংগঠনগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে ফ্রি কনসার্ট করা শুরু করলেন, লক্ষ্য তখনো ভূমিষ্ঠ না হওয়া 'বাংলাদেশ' নামক শিশুর জন্যে ফান্ড সংগ্রহ। ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার চিত্র বহির্বিশ্বকে জানাতে ছুটলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। পাকিস্তানী সৈন্যরা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যাচারের কি নির্মম দাগ সৃষ্টি করে চলেছে তা বুঝালেন বিশ্বকে এবং অব্যাহতভাবে এই প্রত্যয়ী ভ্রমণ চললো আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত।

যখন উচ্চারিত হয়-
"...And the students at University
Asleep at night quite peacefully
The soldiers came and shot them in their beds
And the terror took the dorm awakening shrieks of dead
And silent frozen forms and pillows drenched in red"

তখন আমাদের ঝাপসা চোখের জাফরিতে কি দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে না? আমি জানি গুটিকয় লোক ছাড়া সবাই ভাসে চোখের জলে।
স্বাধীনতা যুদ্ধে সবাই রণক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে ছিলেন না। হাজার নিরস্ত্র মানুষ, যার মধ্যে অনেকেই নারী এবং শিশু তারা যোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন খবর দিয়ে,

লুকিয়ে রেখে কিংবা যাতায়াতে সহায়তা করে। নিদেনপক্ষে অস্ত্র স্থানান্তর করে, খাবারের যোগান দিয়ে, আশ্রয় - শুশ্রূষা বাড়িয়ে দিয়ে।

পণ্ডিত রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন- এর নাম উচ্চারিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' তো মোছার নয়। অথচ ভিয়েতনাম যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতাকারী, শান্তির দাবীতে দু'বার জেলখাটা মুকুটবিহীন 'peace queen' এর নামও আমরা অনেকে জানি না। এটাই আমাদের দান, বাংলাদেশ নামক এক সন্তানের বিদেশিনী 'মা' কে। তার বহু গানে তৎকালীন পাকিস্তানী সামরিক জান্তার ধর্ষণ, হত্যা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে তীব্র ঘৃণা।

সিতারা, তারামন বিবি, উডারল্যান্ড বীরপ্রতীকদের খুঁজে বের করতে আমাদের কত বছর লেগেছে তা আজ সবার জানা। অনেক দেরী হয়েছে, তবু কখনো না হবার চেয়ে হওয়া ভালো দেরীতে হলেও; এই বছর জোয়ান বায়েজ ৬৩ বছরে পা রাখবেন। আসুন তাঁকে সবাই স্মরণ করি, একবার হলেও বলি "তোমার মতো বন্ধু এখনো আমাদের বড় প্রয়োজন।"

যুদ্ধজ্বরে আক্রান্ত এই সাম্প্রতিক বিশ্বে যুদ্ধবিরোধীদের মানসপটে তিনি শতায়ু হয়ে জ্বলুন - এ কামনা আমাদের। শেষ করছি ১৯৬৪ সালে আয়কর দেয়া বর্জন করে জোয়ান যে চিঠি লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করে-

"I do not believe in war, I do not believe in the weapons of war... and I am not going to volunteer 60% of my year's income tax that goes to armaments." (Joan Baez)

➢ ইত্তেফাক, আনন্দ বিনোদন
ফিচার
৩১ মার্চ, ২০০৩.

এইসব দিন-রাতপঞ্জি

'দোস্ত, তুই আমার মা লাগস, ১০০টা টাকা দে'- কথা ক'টা ক্রমাগত শুভ্র বলে যাচ্ছে। খুব দ্রুত পা সরিয়ে ফেললাম। কী যন্ত্রণা, ব্যাটা পা ধরতে আসছে!

মাধ্যমিকে ৮৫৫, উচ্চ মাধ্যমিকে ৮৬৪ পাওয়া আমার বন্ধু শুভ্র। কী গুডি বয়ই না ছিল! ভাঙা পরিবারের ছেলে। তবু কখনো বাবা-মার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিনি। সবাই ওকে 'হিরোঞ্চি শুভ্র' বলেই ইদানীং ডাকে।

কেন এই পরিণতি? মিউজিক করতে গেলে না কি একটু-আধটু ...। যতবার মানা করেছি ততবার উদাহরণ - জিম মরিসন, এরোস্মিথ, আযম খান, জেমস ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত! মাল না খেলে না কি ভাব আসে না, ও লিখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ডায়ালগ 'আহ্, তুই মা'য়া মানুষ, তুই আমাদের এসব সাধনার কথা কী বুঝবি!'

নিরূপায় খালাম্মা (শুভ্রর মা) বছরখানেক আগে শেষ চিকিৎসা হিসেবে বিয়ে দিলেন ছেলের। মেয়ে ডিভোর্স করল ছয় মাসের মাথায়। মেয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, শুভ্রর মনুষ্যত্ব, পুরুষত্ব কিছুই সংসার করার উপযোগী নেই।

গান সাধনার 'গ' ও অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু নেশার আদি-মধ্য-অন্তহীন হাতছানি। তপ্ত গ্রীষ্মে মনটা ভিজে ওঠে বোকা ছেলেটার জন্য। টাকা না দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে হাঁটতে থাকি, কানে বাজে শুভ্রর গান-

শুনতে কি চাও দিন কিংবা রাতপঞ্জি
গাঁজার ধোঁয়ায় স্নান,
ডাইলে জলে কুলকুচি...

মনে মনে ভাবি এই দিন-রাতপঞ্জি কি বদলানোর নয়? গানের অঙ্গনটা হতে পারে না নেশামুক্ত - শুচি?

➢ প্রথম আলো, পাঠক ফিচার বন্ধুসভা
বিষয় : মাদকবিরোধী বিশেষ সংখ্যা
ফিচার
২৫ জুন, ২০০৩.

দ্বিখন্ডিত দৈনন্দিন

'মুখটা সামান্য উঁচু করুন। জ্বী ঠিক আছে: ওড়না গুছিয়ে তাকান। ব্যস্, পারফেক্ট।' পনেরো মিনিট ধরে এই কথাগুলোই শুনছি। শালা, কোথাকার কোন মডেল ফটোগ্রাফার তুই! একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে কোয়ার্টার ঘণ্টা আলোক প্রক্ষেপণ করা লাগে!-আবার মনে মনে কথা বলছি, এমনই চলে যখন তখন। মুখে কিছু বলি না, ভাবনার জগতে কুৎসিত সব কথা বলেই চলি।

: তোকে আসলে বুঝতে হবে তোদের সম্পর্কের কোন গন্তব্য নেই। তোর এখান থেকে সরে আসাই ভাল। চারুকলার সামনে বসে আছি এক ঘণ্টা ধরে। এষা, রিমনকে উপদেশ ঝাড়ছে : কারণ নোভা-রিমনের এসব প্রেম প্রেম খেলা নোভা'র মা কখনোই মেনে নেবেন না। তুই কিছু বল! এড়াতে হাসলাম।
মাগী, তুই চুপ থাক্ রিমন-নোভার ডেস্টিনি নাই, তোর আছে! আমার 'ডেস্টিনি চাইল্ড'! তুই যে তোর আপন দুলাভাইয়ের সঙ্গে শুচ্ছিস তোর কি হবে? এষা আমার ভাল বন্ধুদের একজন। আমি ওর সম্বন্ধে এসব কি ভাবছি!

ভাগ্য বিড়ম্বিত নারীদের কল্যাণে কাজ করার জন্যই আমরা একত্রিত হয়েছি। মনে রাখতে হবে, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে কখনোই উন্নতি সম্ভব নয়। আজকের এই বিশ্ব নারী দিবসে...শুয়োরের বাচ্চা থাম। প্রতি বছর তোর এই বক্তৃতা শুনছি 'নারী দিবস' এ। নারী-অন্ধকার-আলো, কতবার বলবি শব্দগুলো! সেই যে বছর কয়েক আগে এলাকায় পানির অভাবে তোর কুয়া থেকে পানি নিতে গিয়ে দশ বছরের শেফালী ধর্ষিত হল! লতিফ হারামজাদা মুখ বন্ কর্। -কেন এমন ভাবছি? লতিফ সাহেব আমাদের নির্বাচিত এমপি। এমনতর ভাবনার প্রকাশ আমার নিরাপত্তা কেড়ে নেবে। নিঃশব্দে গুঞ্জনও বিপজ্জনক। কি হবে আমার!

: 'ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তোকে। যা কাজ জানে কম্পিউটারের, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এখন।' নিপার দিকে তাকিয়ে আছি, মুখে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য সম্মতির হাসি। খানকি, ঠাকুর তোর বেস্ট ফ্রেন্ড না, বল্ ব্রেস্ট ফ্রেন্ড। ছিনাল, তোর বাবা-মা গ্রামে গেল যেদিন সেদিন দুপুরে তোর বাসায় গিয়েছিলাম। কারেন্ট না থাকায় জানালা দিয়ে ডাকতে গিয়ে যা দেখার দেখে ফেলেছি। তোমার অষ্টম ব্রেস্ট ফ্রেন্ড, বেশ্যা।

ধর্ষকরা ধর্ষণের ছবি তুলে রাখে, নেগেটিভ না দেয়ায় কিশোরীর আত্মহত্যা...প্রতিটি দৃশ্য আলাদা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি। মা, মা গো এতদিন অসঙ্গতিগুলোর পেছনের কথা ভাবতাম, এখন যে ছবিও মনে ভাসে। প্রতিদিনের এসব চাপ সইতে পারছি না, আকাশ মাথায় ঢুকে পড়ছে, ফুঁসে উঠছে মনন। ঈশ্বর আমায় মায়ের গর্বে ফিরিয়ে দাও। ভাবশূন্য আমি 'দ' হয়ে পড়ে থাকি

সহনীয় উষ্ণতায়, আঁধারে। না, না, পত্রিকা পড়ব না। চোখ চলে যাচ্ছে পত্রিকার পাতায় 'মেয়েটার জরায়ু ছিঁড়ে যায়, একটা ট্রমার মত...' আল্লাহ তুমি জরায়ুর নিশ্চিন্তিও কেড়ে নিলে! মায়ের ফুটো গর্ভ থেকে অপরিণত আমি পড়ে যাচ্ছি, তোমরা আমায় ধরো। পড়তে পড়তে রক্ত মাখামাখি দুঃস্বপ্নে অলীক একজগতে আবার বেঁচে উঠি নির্বিকার কারুণ্যে-দেশের অর্ধেক, উন্নতি ইত্যাকার জট পাকানো দড়িতে নারীর নগন্য ভবিষ্যথ ঝুলিয়ে।

➢ যুগান্তর, স্বজন সমাবেশ
বিষয় : অণুগল্প
৫ নভেম্বর, ২০০৩.

‘ধর্ম = মনুষ্যত্ব’,’ সে আসিবে

‘নারে, কোরবানির দিন আমাকে বেরোতে বলিস না, কেমন যেন লাগে।’ এই একদিনই কান্তা আমাদের সঙ্গে ঘুরত না । সারা বছর আমরা পূজা-পার্বণ-ঈদে-ক্রিসমাসে-মিলাদে-থার্টি ফার্স্টে একসঙ্গে থাকতাম। ঢাকেশ্বরী মন্দির, জগন্নাথ হল, কালী মন্দির কোথায় আমরা পূজো দেখিনি! সমানে সমান জামা নিয়েছে কান্তা ঈদে। বহু পরে, বহু বছর পরে জেনেছি আত্মার বন্ধন সব নয়। ‘ধর্ম’ বলে একটা হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা বিহীন বস্তু আছে এবং তার অপব্যাখ্যায়-অপব্যবহারে কান্তারা এখানে সংখ্যালঘু। আমাদের অদ্ভূত স্কুলে আরবি-ইসলামিয়াত মিলে ২০০ মার্কস ছিল। কান্তাকে আরবির বদলে হিন্দু ধর্ম পড়তে হতো আর ইসলামিয়াত ছিল অবশ্য পাঠ্য। আমার সংখ্যালঘু বন্ধু সংখ্যাগুরু হতে ভারত চলে গেল। বুকের একপাশটা আজও ফাঁপা, সংখ্যাগুরু হওয়ার গুমর সে শূন্যতা ভরাট করতে পারে না।

মুসলমানরা হিন্দুদের, হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ করে, সেটা শেষ হলে আদিবাসীরা আক্রমণের শিকার হয়। তারপরও কাউকে না পেলে নিজেরা নিজেরা কামড়াকামড়ি করে-শিয়া-সুন্নি- কাদিয়ানি-আহমদিয়া। চলতে থাকে এসব চক্র। সাদ্দামের জন্য আমাদের তথাকথিত মুসল্লিরা বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল বের করে, বাঁশখালীতে লক্ষ চিতা জ্বললেও বুক কাঁপে না।

মুসলমান না, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আমি কেউ না। আমি কান্তা রায়ের আশৈশব বান্দবী,অনুপ বড়ুয়ার এক গিটারে গান গাওয়ার সঙ্গী, ফিলিপ রোজারিওর ক্রিকেটের মাঠে স্কোর রাখার সহযোগী। আমার বুকে সবসময় এমন বাংলাদেশ। আনি এই বাংলাদেশ একদিন সারা পৃথিবীর সামনে সহমর্মিতার মডেল হবে- এ আমার বিশ্বাস। এই স্বপ্নের মাঝে আমার আজন্ম বসবাস। সে দিনের অপেক্ষায়...।

➢ যুগান্তর, স্বজন সমাবেশ
ফিচার
বিষয় : আমার পৃথিবী, আমার দেশ - আমার মতো নয়
৭ জানয়ারী, ২০০৪.

ব্যক্তিগত শীত

বের হব না বাসা থেকে কোনভাবেই - একে তো রোজার ঈদ, তার ওপর শৈত্যপ্রবাহ চলছে। বন্ধুদের টানাটানিতে গেলাম টিএসসি - নোমানের জন্মদিন। গোল হয়ে ইফতারি কামজন্মদিনের খাওয়া। ‘উদলা দিবস শুভ হোক, আবার তুই নাঙ্গা হ’ ইত্যাকার শব্দে হৈ হৈ চলছে জব্বর। নোমানের পেয়ারি (প্রেমিকা) বারবার বাসায় যাওয়ার জন্য হাঁকপাক করছে। এর মধ্যে আমার মনে হলো - ইস্, আমি একদম খালি হাতে এসেছি! হাজার হোক ভোটকা (মোটা বলে নোমানকে এই সম্বোধন) সাফল্যের সঙ্গে ২৪ বছর, মানে দুই যুগ পার করল!

চৈতীকে শাহবাগ থেকে রিকশায় তুলে নোমান, মণি, মৃদুল, আমি ফুলের দোকানে ইতিউতি হাঁটছি, দাঁড়িয়ে ফুল দেখছি। নোমানকে ফুল কিনে দেওয়ার জন্য দামাদামি করছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক কাঁধে হাত দিয়ে বললেন. ‘ভাই, একটু জায়গা দিন তো।’ আমি সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার বন্ধুরা খেপে আগুন- কেন ওই লোক আমার গায়ে হাত দিল! পাশে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করছি। পরিস্থিতি ঘোলাটে হচ্ছে দেখে সামনে গিয়ে বললাম, ‘মণি, ছেড়ে দে। উনি বুঝতে পারেননি।’

আমার গলা শুনে ভদ্রলোক হা। জিন্স, খদ্দরের পাঞ্জাবি, খদ্দরের চাদরে ঢাকা লম্বা চুল, মাঙ্কি ক্যাপ সবই ভদ্রলোককে ভুল বুঝতে সহায়তা করেছে।

এবারের জন্মদিনে নোমান বিবাহিত, দেখাই হয়নি। আমি চাকরি নিয়ে ডুবে আছি। শীত এল, শীত চলেও যাচ্ছে। খুব ইচ্ছে করে সেসব আড্ডায় ফিরে যাই, বন্ধুর গায়ে গা ঠেকিয়ে শীতার্ত সন্ধ্যা উষ্ণ করে তুলি। আমাদের বন্ধুতার শুষ্ক শাখে, শূন্য সভা, মৌন বাণী - এত কিছুর পরও কেউ কাউকে ভুলিনি, এ আমি নিশ্চয় জানি। তাই না নোমান, মৃদুল, আরিফ, মণি?

➢ প্রথম আলো
পাঠক ফিচার, বন্ধুসভা
বিষয় : শীত
১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪.

নবীদা এখন ভীষণ ব্যস্ত

সময়ের, তারুণ্যের একটা আলাাদা আবেদন থাকে। সেই দাবিতে মানুষ কত কাজই না করে। অনেক বছর পর তা হয়তো সুখস্মৃতি হিসেবেই কেবল মনের গহনে থেকে যায়। নিরানব্বই সালের মাঝামাঝি কোন এক মাস। পুরো গ্রুপ পাবলিক লাইব্রেরির সাইকেল রাখার ছাউনিতে আড্ডায় মত্ত। কথা নেই বার্তা নেই ঝুম বৃষ্টি। কিছুক্ষণ নবীদা'র (পথিক নবী) গান শুনলাম বৃষ্টির সুরের সঙ্গে। পানি বাড়ছে, তেলাপোকা বের হচ্ছে। অভিলাষদার বাঁশির সুর ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেয়েদের তেলাপোকা দেখে ভয় ও চিৎকারের নীচে। হঠাৎ কে যেন একটা ফুটবল যোগাড় করে আনল। সবাই নেমে পড়লাম, অঝোর জলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে চললো বলখেলা। সে যে কি আনন্দ!- লাইব্রেরির ক্যান্টিন বন্ধ। বৃষ্টি তো থামে না। চা না খেলে যে শীত কমবে না। হি হি করে সবাই কাঁপছি। কোহিনূরের দোকানে এক একজন চার কাপ পর্যন্ত চা খেয়ে ফেললাম। ছেলেরা বহু কায়দা করে পলিথিন দিয়ে পেঁচিয়ে সিগারেট টানার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বৃষ্টি দেখলেই সেমিনগুলোর কথা মনে হয়।

এখন বৃষ্টি আসে মনে মনে। নবীদা ভীষণ ব্যস্ত শিল্পী। যে যার জীবিকা নিয়ে আমরা ছড়িয়ে আছি দেশের এখানে ওখানে। মেঘেদের ওজন কমে, কেউ গেয়ে ওঠে না রূপমের সেই গান- 'কমলো মেঘেদের ওজন, বৃষ্টি বলে প্রয়োজন তাকে, যে খোঁজে আমাকে...।' আমরা এখন আর কেউ কাউকে খুঁজি না। বছরের প্রথম বৃষ্টিতে ভেজার পাল্লা দেই না। পকেট ঝেড়ে খিচুড়ি খাবার আয়োজন কোথাও চলে না। বর্ষা আসে, বর্ষা চলে যায়। জীবনের দাবির কাছে আমরা অসহায়। শহুরে বৃষ্টি বড় সুখ খোঁজে, সে চায় পাঁচতলার উপর থেকে শার্সি দিয়ে জল পড়ার দৃশ্য দেখতে। তাই দেখি ৯টা-৫টার অপিসের বদ্ধ জানালা দিয়ে। জানি না, আমার মেতা নস্টালজিয়ায় নবীদা, নোমান, আরিফ, মৃদুল, কাজলা, মণি, মাবরুকাসহ আরও অনেকে ভোগে কি না। নবীদা, আসলেই আমাদের পৃথিবী আমাদের মতো নয়। এক বর্ষায় আমাদের একটা দিন চিল কেউ জানতো না, আজ আমি জানালাম সবাইকে। আজ শাহবাগের মাথা খারাপ, কেবলই মনজুড়ে বর্ষার আলাপ। ভালবাসি তোমাদের, প্রতি বর্ষাকে যেমন বাসি। হারিয়ে যেও না...।

➢ যুগান্তর, স্বজন সমাবেশ
ফিচার
বর্ষা সংখ্যা
২৩ জুন, ২০০৪.

বন্ধু থাকো, আমার মনে...

বাবা-মা-ভাই-বোন বিভিন্ন রকমের আত্মীয় পেতে মানুষের কোন নিজস্ব যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। বিয়ে-শাদিও হয়ে যায় অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। একমাত্র 'বন্ধু' এই সম্পর্কটা পুরোপুরিই ব্যক্তির আপন অর্জন। জীবনের চলমানতায় কত মানুষ আসে-যায়, খুব ক্লান্তির পর অবসরে খুঁজে ফিরি যে মুখ তা আর কারও নয়, বন্ধুর। স্কুল ছেড়েছি দশ বছর। তবু মনে হয় এই তো সেদিনের কথা-৯৩'র ২১ ডিসেম্বর এসএসসি'র ফরম ফিলাপের ডেমোনেসট্রেশন ক্লাস হবে। আমরা ছ'জন মানে- লিমা, শর্মিলা, মাবরুকা, জেরীন, কাজলা এবং আমি সেই ক্লাসে না গিয়ে লিমার জন্মদিন উদযাপন করতে সাভার চলে গেলাম। স্কুল থেকে বাসায় ফোন। পরেরদিন ফরম ফিলাপ করতে দেবে না-অবস্থা এমনই সঙ্গীন। কি এক ভয় জড়ানো অনুভূতি, একজন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরে বসে আছি। এখন তার চেয়েও কঠিন বিপদ হয়। একাই সব সামলে নেই কেমন করে জানি। ভীষন জ্বরে পড়লে ভাবি, ইস্, শর্মিলাটা যদি পাশে থাকতো! ওরা সপরিবারে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে। জেরীন, কাজলার ভাইকে বিয়ে করে এক বাচ্চার গর্বিত মা। লিমা প্রবাসী স্বামীর কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দিন গুণেই যাচ্ছে। শুনেছি, কাজলারও বিয়ে। ম্যাপল্ লিফ- এ বাচ্চাদের ভালই পড়ায় কম কথা বলা মেয়েটা। মাবরুকা কতজনকে টোফেল, আইএলটিএস এর বৈতরণী পার করাচ্ছে 'সাইফুরস'- এর শিক্ষক হয়ে কে জানে! আমি নিজে ব্যাংকে বসে অন্যদের টাকার হিসাব করি দিন-রাত।

আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিকশায় ঘোরা, সম্মিলিত আড্ডার তুমুল হুলস্থূল আর কখনও ফিরবে না। যেমন ফেরেনি অপরাপর নারীদের। তবু কোন ক্লান্ত তপ্ত দিনে মনে মনে বলে উঠি-'বন্ধু আমার কেমন আছিস বড্ড জানতে ইচ্ছে করে...'।

➢ যুগান্তর, স্বজন সমাবেশ
ফিচার
বিশ্ব বন্ধু দিবস সংখ্যা
২৮ জুলাই, ২০০৪.

আত্মকথা

দিনটা আমার খুব ভালোই মনে পড়ে-ভদ্রলোক তার ম্যারেজ ডে তে বউকে উপহার হিসেবে আমাকে তুলে দেন। আমি নোকিয়া- ৩৩১০। প্রথমে মালিকের অত মোটাসোটা অবয়ব দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরে তার তুলতুলে হাতের ছোঁয়ায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। মায়ের মতো যত্নে আমাকে দু বেলা ভরপেট খাবার (চার্জ) খাওয়ানো, রাত ১০টার পরই ঘুম পাড়ানো (অফ করে দেওয়া) করেছেন আমার মালিক লিমা। তার কত আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হয়েছি আমি! ডলমার হাত ভীষণ ঘামে, তাই আমার জন্য একটা জামাও কিনলেন। কাপড়ের জামায় ঝুলিয়ে যখন রাখতেন, তার বুকের কবোষ্ণ উষ্ণতায় বহুবার ফেলে আসা মালয়েশিয়া, আমার জন্মস্থানের কথা মনে পড়েছে।

একদিন ঝড় -জলের সন্ধ্যা, লিমা অফিস থেকে ফিরছিলেন। রিকশার পথ রোধ করে দাঁড়াল চাপাতি হাতে ছিনতাইকারী। আমাকে নিয়ে দৌড়। লিমাও ছিনতাইকারীর পেছনে দৌড়। ছেলেটা ধরা পড়ল, আমি আবার লিমার হাতে। শিউরে উঠলাম চাপাতিতে কেটে যাওয়া তার হাতের রক্ত দেখে। তবু মনে মনে 'বাহ্' বলে উঠলাম। এই দেশের নারীর সাহস দেখে হলাম মুগ্ধ।

এই অংশটা আমার শেষ স্মৃতিচারণ, কারণ চার্জ ফুরিয়ে আসছে। শিশুপার্কে গিয়েছিলাম শুক্রবারে। প্রচন্ড ভিড়ে একটা লোমশ হাত আমাকে লিমার ব্যাগ থেকে তুলে নিল। এবার আর শেষরক্ষা হলো না। যেকোনো মুহূর্তে আমার মেমোরি সেল (সিম কার্ড) ছুঁড়ে ফেলবে লোমওয়ালা।

হারিয়ে যাচ্ছে লিমার স্মৃতি...ব্যাটারি লো...আমাকে দরদাম করছে চোরাই মোবাইল মার্কেটের দাঁতভাঙা এক লোক...। এই, এ-ই-তো হয়ে গেলাম...বিদায়-শেষ বিদায় প্রিয় লিমা...। আমি তোমার ওই নরম হাত ভীষণ মিস করব... আমাকে ভুলে যেও না নতুন কারো প্রেমে, নতুন মডেলের মোবাইল পেয়ে...।

➢ প্রথম আলো
পাঠক ফিচার, বন্ধুসভা
বিষয় : মুঠোফোন
২০ অক্টোবর, ২০০৪.

সেই তারুণ্যের কথা বলতে এসেছি

জীবনের দুঃসাহসী গল্প মানুষ কখন রচনা করে? আমি বলবো- ঘোর তারুণ্যে। সে কি শুধু কাগজে কলমে, না কি বাস্তবেও। মনে হয়, বাস্তবেই সবচাইতে বেশি। কেন করতে পারে এমন প্রাণবাজি রাখা কাজ? আরে ভাই, তারুণ্যে তো সেভাবে আসে না প্রাত্যহিকতা, লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ। নীতুর কথা দলুন। থাক ধরার দরকার নেই আমিই বলি-

এসএসসিতে তিন মার্কের সর্টেজে বোর্ডস্ট্যান্ড হতে ফসকে গেল নীতু। এইচএসসিতে ইয়া নম্বরের বোঝাসহ একটা তারা মানে স্টার। তারপর একচান্সে মেডিকেল। আমরা যখন ধুঁকছি আদৌ কোথাও ভর্তি না হতে পারার আশঙ্কায় তখন নীতুর এমন জয় জয়কার। বই থেকে মুখ তুলে দুনিয়া দেখার সময় তো এমন মেয়ের পাওয়ারই কথা না। পায়ওনি। মেডিকেলে পড়ার লাস্ট ইয়ারে মহা ভালো এই ছাত্রীর হঠাৎ কলেজের বন্ধুদের বেশ মনে পড়তে লাগলো। এলো আমার কাছে। আমি পড়তে হয় পড়া এমন ঠ্যাকনা দিয়ে স্টুডেন্ট লাইফ টানার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হওয়ার চেষ্টায় পত্রিকাগুলোতে টুকটাক হাঁটহাঁটি করছি। নীতুকে পরিচয় করিয়ে দিলাম এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। ওমা! আমি তো আমের আঁটি, দু'জনে গভীর বন্ধুত্ব। ওই পত্রিকার সবাই মোটামুটি নীতুর বন্ধু হয়ে গেল। ওই পত্রিকার আয়োজনে সেবার শীতে সুন্দরবন যাওয়া হলো। নীতুও গেল। আমি যেতে পারলাম না। ভ্রমণ থেকে ফেরার পর নীতু ব্যস্ত হয়ে পড়লো ইন্টারনেট নিয়ে। যখন তখন সে অনলাইনে। ঘটনা কি? ট্যুরে শিপে ইন্ডিয়ান আরেক ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয়। ছেলের সঙ্গে ই-মেইল অ্যাড্রেস লেনদেন হয়েছে। সেই সূত্রে তারা নেটে সারাক্ষণই আছে, বন্ধুত্ব ঝালাতে।

বন্ধুত্ব ফোনে, নেটে, চিঠিতে চলছে তো চলছেই। যে নীতু ছেলেদেও মুখ তুলে দেখেনি কখনো, সে মার্কেট ঘুরে আফটার শেভ লোমন কেনে। এমন আরও কত কি! ব্যাঙ্গালোরের হুসেনের নীতুকেই চাই, নীতুও হুসেনকে। ই-লাভে কত আর মন ভরে! নীতুর বাসায় রাজি না। অগুনতি ঘুমের ওষুধ গলাধঃকরণ, স্রষ্টার কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম। হুসেনের সপরিবারে আগমন, সানাই। বাংলাদেশী কন্যা, ইন্ডিয়ান বধূ। শেষে দু'জনেই আমেরিকায় সেটলড। তার মানে তারুণ্যই পারে এমন ঝুঁকি নিতে। ই-লাভকে রিয়েল লাইফে কনভার্ট করতে।

নতুন কোনো পত্রিকা বাজারে আসার কথা শুনলেই আমি তাই নড়েচড়ে বসি। নতুন পত্রিকা, পাঠকের নতুন সংগঠন হবে। শিল্প-সাহিত্যচর্চা হবে, হবে হৃদয়ের আদান-প্রদান। আবার কোনো নীতু-হুসেনের উপাখ্যান রচিত হবে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ইত্যাকার মৌলিক সম্পর্কের অভাবে ভোগা রুগ্ন সমাজটাতে ভালবাসা লাল গোলাপে ফুটবে। আমাদের মতো শখের লেখকরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো- শোনো আমি দুঃসাহসী তারুণ্যেও গল্প বলতে এসেছি, এসেছি শব্দ দিয়ে, খবর

দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষকে গাঁথতে। তারুণ্য যা চায়- নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, তার বার্তা শোনাতে।

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার
উদ্বোধনী সংখ্যা -২
২১ জুন, ২০০৫.

বর্ষাপ্রেমিকের প্রতীক্ষায়

ঘুঙুর বাজছে। রক্ত নাচছে। শরীর জাগছে। জানি আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না। এ একান্ত আমার জন্য নিবেদিত বাজনা। জলতরঙ্গ। রোদকে জলে ধুয়ে আষাঢ় নেমেছে। রোমকূপে শিহরণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময়। জলের পতন আর পাতার কাঁপন...জবুথবু শালিক পাখি তার পরিবারসহ...অসহায় রিকশাযাত্রী, বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পর্দার টানটানি...থকথকে কাদা...বর্ষায় রাস্তা খুঁড়লে যা হয়...জুতো ডুবানো পানি রাস্তায়...দেখে যাই। চট করে ঘোর ভাঙে। ফোন।

-আপনাকে আধঘণ্টা আগে ওশিন এগ্রোর ফাইলটা দিতে বলেছিলাম। প্লিজ পাঠাবেন।
-আসছি।
বলেছিল কি ফাইল দিতে? আমি তো ততক্ষণে ফাইল দিয়ে নৌকা বানিয়ে বংশী নদীতে ছেড়ে দিয়েছি।
প্রায়ই মনে হয় জলেই আমার মরণ লেখা। তারপর ভাবি মাছের সঙ্গে পানির সখ্য, মাছ তো ডাঙ্গায় মরে, জলে সে বাঁচে। মীন রাশির জাতিকা বলেই কী বর্ষার প্রতি আমার এ দুর্বোধ্য পক্ষপাত!

-ইস্, কী অসহ্য! এরকম বৃষ্টি, আকাশের কিডনি ফেইল। বহুমূত্র। ঝরছে তো ঝরছেই।
কলিগের এমন উচ্চারণ আমার ভেতরটা তিতকুটে করে তোলে। এরা কেন একটুও প্রকৃতিকে অনুভব করে না! কাপাস তুলোর মতো উড়ছে জলকণা। কি অদ্ভূত মেঘের ভাষা। ভীষণ ভারি, হালকা, গম্ভীর কালো-কত রূপ! কেউ দেখে না এগুলো? কালিদাসের মেঘদূত তবে বৃথাই গেল! কখনো বৃষ্টি নামে-বালিকারা যেমন ঝাঁ করে নারী হয়ে যায় তেমন তোড়ে; দারুণ গতিময় কিন্তু নড়বড়ে গন্ত ব্যেও। ঝিরঝিঐে বৃষ্টি ানেকটা সংযমী প্রেমিকের মেতা, চুলের ডগা থেকে যার যাত্রা শুরু, তারপর...এভাবে মনে-শরীরে দুন্দুভি বাজিয়ে চূড়ান্ত সঙ্গম। আহা! ঝুরঝুর বারি ঝরুক সব সময় । সৈনিকদের মার্চপাস্টের মো ধারা আর যারই ভালো লাগুক, আমার লাগে না।

কাঁচ ঘেরা শীতাতপে ভাবনারা কেবলই লাট খেতে থাকে। কাজের স্তূপ জমে। বর্ষাপ্রেমী কন্যা ফাইলে নাক ডুবায়, চোখ বুলায়। তার আর্দ্র মন আষাঢ়ে মিশে চোখের কোণে ফেলে আসা দিনের ছবি এঁকে যায়। হে, মেঘ মেদুরও বরষায় কোথা তুমি...নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি কর্মজীবী নারীর খাপে, কে খুঁজে দেবে সেই ফুল যা ঝরায়ে কাঁদছে বনভূমি?

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার :অণুগল্প সংখ্যা , ১২ জুলাই, ২০০৫

ভালোবেসে চলে যেতে নেই

আয় সখী জলে নামি যৌবন বাজি রেখে... । অতল জল। আমি সাঁতার জানি না। রুনা জানে। পানি থেকে মৎস্যকন্যা বিপুল রহস্য নিয়ে তাকায় আমার দিকে।

- আমাদের কি হবে বল্ তো!
- সবার যা হয় তাই হবে।

খিলখিল হাসি। বিচ্ছুরিত চাপল্য দশদিগন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

শেষাবধি সবার যা হয় আমাদের তা হয় না। বড় হতে হতে রুনা ধীরস্থির শান্ত কিশোরী, চুপচাপ। আমি দস্যিপনাতে এক নাম্বারে। স্কুলে যে কোন অঘটনে অবধারিতভাবে আমার নাম। রুনা'র সব মানা কোমল ব্যক্তিত্বে আমার দুরন্ত মন স্বস্তিবোধ করে না। তাই ক্লাশ টেনে উঠতে উঠতে পাঁচ বছর একই বেঞ্চে বসা বান্ধবীকে আলতো করে সরিয়ে দেই। রুনা আর্টস, আমি সায়েন্স।

ওর অভিমানকে ন্যাকামীর মতো লাগে। আমি মানেই গার্জিয়ানদের করুণ মুখ- কখন কি করি! রুনার মা আমার সাথে মিশতেই মানা করে দেন। আমার তখন "বয়েই গেলো" ভাবে গা ভাসানোর কাল।

আমাদের গ্রুপের ততদিনে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার পড়া শেষ। সস্তা পেপার ব্যাক একসাথে দাগিয়ে পড়ার কালও অতীত। ধোঁয়ার মাঝে কি সুখ কিংবা ঢাকা শহরে রিকশার ঘণ্টা তাও বোঝা সারা। দু-একজন প্রেমেও দীক্ষা নিয়ে ফেলেছে সাহসে বুক ঠুকে। এসবের মাঝে কোথাও রুনা নেই। ও পড়ে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো, দাস্ ক্যাপিটাল; আমরা তসলিমা, সমরেশ, ইমদাদুল হক মিলনের মাখো মাখো প্রেম কাহিনী পড়েই ভাবছি- বাহ্, বাংলা সাহিত্য বেশ জানা হলো! এভাবে স্কুল লাইফ শেষ।

রুনা হলিক্রস, আমি ভিকারুননিসা। ভুলেই গেছি নতুন বন্ধুদের ভীড়ে রুনা নামের বেণী দোলানো কোন বন্ধুর কথা।

এক বার্থডেতে দেড় বছর পর দেখা।

- জানিস আমার না কলেজে একটা বন্ধুও হয়নি।

শব্দ ক'টা আলগোছে আমার কানের কাছে ছেড়ে দিয়ে রুনা ভীড়ের মাঝে নিজেকে লুকায়। আমি 'আহা' বলে ঢুকে যাই উন্মাতাল গানের সুরে।

কলেজ ডিঙ্গিয়ে ভার্সিটি। হঠাৎ দেখা।

-আরে তুই! আমি এনথ্রোপলজি, তুই?

-দর্শন।

-শেষ পর্যন্ত আর্টস! এই বলে ফিকে হাসে।

আবার অদর্শন। ক্যাম্পাসে গেলেও আমার তেমন একটা ক্লাশ করা হয়ে উঠে না। পাঠ্যবই একটুও টানে না আমাকে।

- এই রুনা'র খবর জানিস? স্কুলের মুখচেনা এক বন্ধু আচমকা ভার্সিটিতে দেখা হতে আমাকে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

- না তো!
- আরে জানিস না, ও তো ডিপার্টমেন্টের এক ম্যারেড স্যারের প্রেমে হাবুডবু! গত কয়েক মাস ধরে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত।

আমি চমকাই। মনে মনে বলি - ইশ্...। এক রাতে রুনা'র ফোন-

-জানিস আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

-কবে, কার সঙ্গে?

- কাজিন। অনুষ্ঠান পরে হবে।

রুনা'র অসুস্থতা বাড়তেই থাকে। আমাকে হঠাৎ হঠাৎ ফোন। কথার কোন কিনারা নেই।

-এই শুন্, ডিভোর্স দিতে হয় কিভাবে?

-কেন?

-এই লোকটা আমার সাথে যেন কেমন করে। আমার খুব কষ্ট হয়, শরীরে - মনে। আবার ডুব। কোন খবর নেই।

- এই আমাকে তুলে নেবার অনুষ্ঠান, আসিস।

গীটার বাজাতে যাচ্ছি সেদিন কনসার্টে। যাওয়া হয় না।

- নাম দে না একটা, আমার মেয়ের জন্যে।

নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি এবার যদি মেয়ের জন্যে ও স্বাভাবিক হয়!

তবু ওর ভালো লাগতো না জোর করে বেঁধে দেওয়া ঘর। ভয় হতো আমার ওকে নিয়ে।

-শুনেছিস রুনা আত্মহত্যা করেছে। ওর বাচ্চাটার বয়স মাত্র ছ'মাস।

চল্ সখী, নীরব বর্ষা নামাই নীল কমলের বনে। আঁধারকে কেমন গোসল করাব প্রতি জলের ঝাপ্টায়...আমি সরব শ্রাবণে কুঁকড়ে উঠি প্রতি বছর বন্ধু বিয়োগের স্মৃতিতে, কী যেন এক অনুতাপে। কানে বাজে - 'জানিস আমার না কলেজে একটা বন্ধুও হয়নি।' ওর দেয়া বন্ধুত্বের অপূর্ণ দায়ভার আমি প্রতিনিয়ত বয়ে চলি। ভাবি, আমার হয়তো আরও বেশী কিছু করার ছিলো যা করিনি। একাকীত্বের ঘেরাটোপ অতিক্রম করতে গিয়ে ও হয়তো একটু বেহিসেবীই হয়েছিলো কিন্তু তাই বলে এমন প্রস্থান! আমি কি পারতাম না ওকে ফেরাতে? গোপন কান্না বয়ে চলি, সন্তর্পণে বলি এভাবে যায় না, এমন করে চলে যেতে হয় না।

তুই কি আমার কথা শুনছিস্, মেয়ে?

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার
বন্ধুদিবস সংখ্যা
২ আগস্ট, ২০০৫.

শোনো বলি ইসাবেলা

ইসাবেলার কাছে আমার প্রেমের প্রথম পাঠ, আপ্লুত সমর্পনে। ভালোবাসার কেয়ারি করা বাগানে এত দ্রুত আছাঁটা জংলি ঘাস গজাবে. হাঁটু অব্দি ঢেকে দেবে, সে কথা কে জানত! যন্ত্রণার শহরের বুকের দহন ছড়িয়ে যায় লেলিহান। ইসাবেলার চোখ থেকে প্রিয়ার কাজল ধুয়ে ধূয়ে নামে, বিপাশা-শতদ্রু (ওর দু'চোখকে আমার বরাবর বহতা নদীই মনে হয়েছে যখন সিক্ত থাকত) ভেসে যায় অতীতের স্মরণে। আমি এক অনাম্নী মানব সেই জল শুষে নেব তেমন আধার আর হতে পারলাম কই! প্যান্টের ব্যাক পকেটে দুঃখের মেঘ জমা রেখে পিচগলা রোদ্দূরে হেঁটে চলি দিন কে দিন। আমার কি এতদিনেও ইসাবেলার কাছে জমেনি কোন ঋণ? মননের অধিকারে শুধু তার পাশে চলা কিন্তু বন্ধুর পথে বান্ধব হবো এ ভরসাটুকুও তার হাতে বিদায় বেলায় তুলে দিতে পারলাম না। এই না পারার অক্ষমতা নিকোটিনে কাটে না, মদিরায় ডোবে না। ব্যর্থ মানুষ তাই মিশে যাই গড়পড়তা জনতার ভিড়ে। ইসাবেলা কি কখনো আমাকে ক্ষমা করবে? সে কি জানবে তাকে কিছুই দিতে না পারার ব্ল্যাকআউট আমাকে কিভাবে দেয়াশলাইয়ের মতো জ্বালায়? হায়, ইসাবেলা! তোমার দেওয়া হাতেখড়ির ভাষা আমি ভুলে গেছি। কষ্টরাতে ঘাই তোলা দীর্ণতা কামনা করে আবার স্লেট-পেন্সিল, তুমি কি আমাকে আরেকবার 'প' তে প্রেম জাগছে মনে' দীক্ষা দেবে? তাহলে জীবন মানে আনন্দ-বেদনার কাব্য - এ সংজ্ঞা ধার্য করে, ইসাবেলা তোমার সাথে ভাগাভাগি করে নেই একজনমের আয়ু, নিঃশ্বাসের দূরত্বে বসে। আমি কি অপেক্ষা করব, ইসাবেলা?

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার
ঈদ সংখ্যা
৮ নভেম্বর, ২০০৫.

তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ

ফিনফিনে কুয়াশার এমন সকাল। জলজ হাওয়াটা বুকের বিষবাষ্প সরানোর মৃদু একটা চেষ্টা চালায়। ছাদের রেলিং এ দাঁড়ানো ইসাবেলা। একটু নীচে সানশেডের দিকে তাকায়, তারপর চারতলার ট্যাংকির দিকে। সামান্য উপরে উঠলে ধোঁয়া ধোঁয়া ভোরের একেবারে গর্ভে ঢুকে যাওয়া যাবে ওর এমন মনে হয়। সদ্য ঘুমভাঙ্গা শরীর কিঞ্চিৎ আলস্যে ভারী। ও সেই দেহই টেনে উঠে যায় পানির ট্যাংকির উপরে। নীচে ব্যস্ত নগরীর আপাত শান্ত মিনিয়েচার ভার্সন। ত্রস্ত মানবকুলের এখনো শশব্যস্ত কর্মযজ্ঞ শুরু হয়নি। রিকশার টুংটাং বেকার ধূলোতে তোলেনি সাড়া। এবেলা কেন যে শৈশব ব্যাকুল স্বরে ডাকে!

ইসাবেলার বর্তমানের লেয়ার কাট্ চুলে একসময় শঙ্খিনী দু'বেণী হতো। শীতের আগে আগেই পাড়ার শিউলি গাছটা কেমন ভাঙচুর করে নতুন গর্ভধারণের বার্তা শোনাতো,আহ্! একটু অন্ধকার থাকতে উঠতে পারলে শিউলি ঝরার শব্দ ও শোনা যেত। তারপর দৌড়, মর্নিং স্কুল। শিশির ভেজা ঘাস, পায়ের নীচে অন্য মজা। এসেম্বলী, ৭টা ১০মিনিট। কচি গায়ে সূর্য লাগছে কি লাগছে না। কোরআন তেলওয়াত। মনে মনে ইসাবেলা ভাবত, কেন ভাই গীতা পাঠ হবে না! ওই যে কান্তা, ওর কেন সুরা ইয়াসিন শুনতে হবে? তারপর শপথ, 'আমি শপথ করিতেছি যে...।' কবে ভেসে গেছে সেইসব শপথ। দেশের জন্যে কিছুই করতে পারেনি।

ইসাবেলা এখন ভয় পায়, ঢাকা শহরকে ওর বোরখা-টুপি-দাঁড়ির এক জটিল কম্বিনেশন মনে হয়। নিজের পাঁচ ওয়াক্ত প্রার্থনার অভ্যাস যে পোশাকের কারণে হোঁচট খেতে পারে তা ও বোঝে।
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...' হায়রে, ভালোবসা! পরিবর্তিত স্বদেশে ঋতুও গিরগিটি - রাজনৈতিক ঘরানার মতো মোটা দাগে দুই ঋতু গরম আর বর্ষা। তৃতীয় পক্ষ আখের গোছায়, তৃতীয় পক্ষের মতোই আসে স্বল্প আয়ুর শীত। ইসাবেলা একসময় কবিতা আবৃত্তি করতো- 'আমি হেমন্তের পাতা ঝরার শব্দে...'।

হেমন্ত, সবচাইতে লাজুক - নীরব বালিকা এই শহরে কবেই পরিচয় হারিয়েছে, যেমন করে হারিয়েছে ইসাবেলা তার শৈশব কৈশোরের বাংলাদেশ। আলগোছে চোখ মুছে ইসাবেলা ভাবে,- 'হেমন্ত' কি পাতাঝরার মতো কাব্যিক নৈঃশব্দ নিয়ে আর কখনো দাঁড়াতে পারবে? সে তো ধর্মনিরপেক্ষতার মতো, যত্ন ছাড়া বাঁচতেই পারে না। তেমন হৃদয় কোথায় পাবে, ইসাবেলা'র বাংলাদেশ?

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার - হেমন্ত, ২৯ নভেম্বর, ২০০৫.

অন্য এক স্বপ্নবাজি রাখছি আমরা বিজয়ে

দিনগুলো এত ক্লান্তির থাকে যে, ইসাবেলার রাত শোয়ার সাথে সাথেই কাত- এমন হয়। বৃহস্পতিবার এলে, সেই রাতে তাই একটু অবসরের মহড়া চলে। স্নায়ু ছেড়ে দেয়া স্বস্তি কাজ করে। সারা সপ্তাহের টুকরো টুকরো ভাবনা মাকড়সার জাল বোনে ঘুমকাতর চোখে। বৃহস্পতিবার রাতেই ইসাবেলা পুরো সাতদিনের পত্রিকা-ম্যাগাজিন সব পড়ে। ইদানীং ইসাবেলা রবির সাথে সোম অথবা সোমের সাথে বুধবারের কিংবা শুক্রবারের পত্রিকার তেমন কোন ভিন্নতা খুঁজে পায় না। জগন্নাথ পাঁড়ে ও সোহেল আহমেদ, ঝালকাঠিতে দুই বিচারক আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত। গাজীপুরে বোমা হামলা, নিহত কয়েকজন। গাজীপুর ডিসি অফিসে বোমা হামলা। চট্টগ্রামে আদালত ভবনের কাছে আত্মঘাতী বোমার আঘাতে পুলিশ নিহত। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন সিলেটের মেয়র গ্রেনেড হামলা থেকে। শান্ত শহর নেত্রকোণা বিধ্বস্ত...এভাবে খবরের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। মাঝে মাঝে অক্ষরগুলো একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে যায় -এমনই অবস্থা। ভারি মাথায় ইসাবেলা ভাবে, থাক্ বাবা, আমার ওপর তো হয়নি! এত চিন্তা করে কি হবে? ওর তো কিছু করার নেই। তার চেয়ে চুপচাপ মজা দেখাই ভালো।

এসব ভাবনার মাঝে হঠাৎ মোবাইলে কম্পন।

- তুই গাজীপুরের ছায়াবীথির 'অমুক' কে চিনতি না?
- হ্যাঁ।
- আরে ঐ যে মারা গেল অ্যাডভোকেট 'তমুক' উনি তো 'অমুক' এর চাচা।
- ইশ্।

তাহলে পরিচিত কেউ মারা গেছে! বুকটা সামান্য ভারি হয়। মোবাইল অফ্ করতে গিয়েও করে না। একটা ছবিতে চোখ আটকে যায়। পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে, মায়ের সাথে ইসাবেলার অফিসে এসেছিলো, 'ফাতেমা'- তার ছবি। আপাদমস্তক বোরখায় আবৃত, মা-মেয়ে দুজনেরই। শুধু ফাতেমার আইসক্রীম খাওয়ার সুবিধার্থে মুখের সামনে নেকাব জাতীয় কিছু নেই। ইসাবেলা তার পাঁচ বছর বয়সে হাফপ্যান্ট, ফ্রক, টি শার্ট ছাড়া আর কিছু পরেছে বলে মনে করতে পারে না। ওর খুব হাসি পায় চাপা ক্ষোভের সাথে। অত্যাচারকারী, নারীকে উত্যক্তকারী পুরুষ পথ ছাড়লো না, সরে যেতে হলো নারীকে বোরখার আড়ালে; এমন কী পাঁচ বছরের ফাতেমারও মুক্তি নেই।
এই তো দেশ, মডারেট মুসলিম কান্ট্রি!

ইসাবেলা স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ ঘুমের রাজ্যে গেলে স্বপ্ন দেখে। যেমন ডিসেম্বর মাস, বিজয়ের মাস এলেই ইসাবেলা তার অকালপ্রয়াত বান্ধবী 'সিমি বানু' কে একবার না একবার স্বপ্নে দেখে আসছে সেই ২০০১ এ ওর মৃত্যুর পর থেকে। বলতে লজ্জা লাগে, ও এক ডিসেম্বরে শহীদ বুদ্ধিজীবি সেলিনা পারভীনকে ও স্বপ্নে দেখেছিলো। নিজেকে প্রায়ই মাত্রাতিরিক্ত স্বপ্নবাজ মনে হয়। এতকিছুর পরও সে দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কেন জানি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে - সাময়িক এই পরাজয় কেটে যাবে, জঙ্গী- মৌলবাদ- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বোমাবাজি ইত্যাকার সঙ্কট যে সুযোগের হাত ধরে বসত গড়েছে "দরিদ্রতা", সেই চরম সমস্যাটি দূরীভূত হলে। দেশটা আবার ফাতেমাদের শৈশব ফিরিয়ে দেবে। এমন ভাবনা ভাবতেই ঘুমিয়েছিলো বলে ইসাবেলা সে রাতে একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখে-

টিএসসিতে হাজার ছেলেমেয়ে দাঁড়ানো, সবার গায়ে টি শার্ট, তাতে লেখা BOMBING FOR ISLAM (PEACE), IS LIKE FUCKING FOR VIRGINITY (ইসলামের নামে বোমাবাজি, কুমারীত্বের আশায় সঙ্গমের মতো)। তার চাইতেও মজার ব্যাপার স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্যের সামনে তথাকথিত এক মাওলানার ফাঁসী হচ্ছে।

ইসাবেলা কি খুব অবাস্তব কোন স্বপ্ন দেখেছে? মনে হয়, না। ওর সঙ্গে একাত্মতায় আমিও আজকাল এ স্বপ্ন দেখছি, শুধু হাজার হতে আমার স্বপ্নে এখনো ৯৯৮ ছেলেমেয়ে প্রয়োজন। আসবেন কেউ? ইসাবেলা আর আমি আপনাদের অপেক্ষায় হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছি।

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার
বিজয় দিবস সংখ্যা
১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫.

ভুলে যাওয়া
মনে রাখা
এবং বর্তমান

'বুঝছেন না আপা, এতদিন আগের কথা মনে রেখে লাভ নাই। আমাদের উচিত ওইসব ভুলে সবাই এক হয়ে কাজ করা। আর একাত্তরে আসলে অত নারী ধর্ষিত হয়নি, যত লাখের কথা বলা হয়'- এই হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, তাতে নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের বর্তমান ভাবনা।

বছর ঘুরে এলেই আমাদের মুখে ফেনা উঠে যায় -'ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, তিন-লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে।' শুনছি প্রতি বছর ভাজন-অভাজন প্রত্যেকের মুখে। 'স্বাধীনতা' এসেছে শহীদ ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকৃতিও পেয়েছেন কেউ কেউ। শুধু মা-বোনেরা হারিয়ে গেছেন 'ইজ্জত' নামক এক বায়বীয় বস্তুর আড়ালে। সম্মুখ সমর, অন্যান্য অবদান কিছুই এই অকৃতজ্ঞ জাতি মনে রাখেনি। কেবল ইজ্জত হারানোর কথাটা বড় মুখে বলে যাচ্ছে যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন। অথচ বিজয় দিবসে যে পতাকা উঠে তাতে পুরুষের শোণিত যতটুকু মেশা বাংলাদেশের নারী সমাজ তার চেয়ে কোনো অংশে কম রক্ত মুক্তিযুদ্ধে দেয়নি। সমন্বয়, আগ্রহ ইত্যাদির অভাবে এদেশের নারীর বীরত্বগাথা 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতেই থেমে যায়।

কত সন্তান জ্বালালো প্রেয়সী তোমার-আমার চিতা

এই নারীর জন্য আক্ষরিক কোনো চিতা জ্বলতে পারেনি পাকিস্তানি আর্মি এবং স্থানীয় রাজাকারদের কারণে। পিরোজপুর জেলা শহরে অষ্টাদশী ভাগীরথীকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি আর্মি ১৯৭১-এ পিরোজপুর শহর ও সংলগ্ন গ্রাম আক্রমণ করার অব্যবহিত পরই বিধবা ভাগীরথী পাকিস্তানি আর্মিদের হাতে ধরা পড়েন। শারীরিক লাঞ্ছনার এক পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানিদের বিশ্বাসভাজন হওয়ার কৌশল অবলম্বন করেন। সাফল্যও আসে।
যথাসময়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এক অপারেশনেই ২৬ জন পাকসেনাকে মারতে সহায়তা করেন। সফল অপারেশনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পালিয়েও যান। রাজাকাররা তাকে ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকাররা তাকে দুই জিপের সঙ্গে বেঁধে খন্ড করে পিরোজপুর শহর ঘোরায়। লাশ যেন কেউ সৎকার করতে না পারে তার ব্যবস্থাও তারা করে। মুক্তিকামী বাঙালির হৃদয়ে তাই ভাগীরথীর চিতা অম্লান হয়ে জ্বলে।
সেলিনা পারভীন, তার সময়ের আগে জন্ম নেওয়া এক নারী। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি যুদ্ধ করেছেন। অন্তিম যুদ্ধ রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। পায়ের নিচে

এক টুকরো মাটির জন্য যে মেয়ে নিরন্তর কাজ করেছেন, সে মাটি পেয়েছেন মরণে, দেশের মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন চির ঘুম।
এত অল্প জায়গায় অত জনের কথা তো বলা সম্ভব নয়। এই উল্লেখ শুধু যুদ্ধে নারীর ভিন্ন মাত্রার অংশগ্রহণ বোঝাতে।

কণ্ঠ আমার রুখেছে সমাজ...

'যুদ্ধের সকল ভাঙন, বুট ও বেয়োনেটের নৃশংস অত্যাচার এবং মৃত্যুর মতো বীভৎসতা সবাই গ্রহণ করলেও ধর্ষণ দুর্ঘটনাটি গ্রহণ করেনি। বাইরে যখন মা-বোনের সম্মান নিয়ে চিৎকার করছে রাজনৈতিক নেতারা, তখন অসম্মান থেকে নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হিসেবে ঘরের কড়িকাঠে আমার খালা যে মাসে ফাঁসি নিয়েছে সে মাস ডিসেম্বর মাস।' (নির্বাচিত কলাম, তসলিমা নাসরিন, পৃষ্ঠা - ২২)

সমাজ বাস্তবতা তাই-ই। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী হওয়ার মানসিক জোর ক'জনেরইবা আছে!
প্রিয়ভাষিণী অপ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা যে কারণে তুলে ধরেছেন জনসমক্ষে সেই লক্ষ্যে আমরা কবে পৌঁছব জানি না। প্রিয়ভাষিণীর চাওয়া একটাই ছিল এবং আছে, যেসব ব্যক্তি এবং সামরিক জান্তা মানবতার বিরুদ্ধে এমন লাগামহীন অপরাধ করেছে তাদের যেন বিচার হয়।

কালের যাত্রা, আমাদের ভাবনা

মুক্তিযুদ্ধে কত নারী ধর্ষিত হয়েছেন? প্রাণবাজি রেখে লড়েছেন দেশমাতৃকার জন্য? ধর্ষিতার সংখ্যা যদি একজনও হয় আমি বলব, 'আমার মাকে যে বা যারা অপমাণ করেছে তাদের যদি ক্ষমা করি আমি বেজন্মা হব। যদি ভুলে যাই রাজাকার আলবদর আলশামস জামায়াত ও পাকিস্তানি আর্মির ক্রিয়াকলাপ, শেষ বিচারে আমার যেন জল না মেলে।'

এ আমার ব্যক্তিগত অনুভব। কারণ উঠতে-বসতে আমি শুনি 'অত আগের কথা ভুলে যান।' আমি ভুলি না, ভুলবও না। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীই বলেন, দেশে এখন জঙ্গিদের যে দৌরাত্ম্য তাতে একটু চুপচাপ থাকাই না কি শ্রেয়। মনে রাখবেন আমাদের নিরবতা, ক্ষমা, ঔদার্য এসবের হাত ধরেই আজকে দেশে জঙ্গিরা এই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পেছে, হুমকি দিতে পারছে 'জিলহজ মাসের এক তারিখ থেকে যেসব নারীকে বোরকা ছাড়া দেখা যাবে তাদের হত্যা করা হবে।'

বিজয়ের অংশীদার নারী তাদের উত্তরসূরীদের বলছি ভাগীরথী, সেলিনা পারভীন, প্রিয়ভাষিণী তারামন বিদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আসুন কিছু করি। প্রিয়ভাষিণীর ভাষায় বলছি, LET'S DO SOMETHING NOT SO SIMPLE AS CRY.

➢ সমকাল
নারীস্থান
বিজয়দিবস সংখ্যা
২০ ডিসেম্বর, ২০০৫.

পড়ালেখা শেষ হওয়ার আগেই বিয়ে, বিড়াল পার...

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কন্যা সন্তানদের আজকাল উচ্চশিক্ষিত করার চেষ্টা করলেও তাড়াতাড়ি মেয়ে দিতে পারলেই আসল কর্তব্য পালন হয়েছে বলে বাবা-মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।
হিমিকা সুন্দরী না, গায়ের রং শ্যামলা, উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফিট। টানা টানা চোখ আর মা কালীর গায়ের রং এর মতো কালো এক ঢাল চুল, এই হিমিকার সম্বল, যা বিয়ের বাজারে রূপের মাপকাঠি হিসেবে কোন মূল্য বহন করে না। আরেকটা জিনিস আছে হিমিকার ক্ষুরধার মেধা, যা সম্পদ না অভিশাপ, সে সিদ্ধান্তে আজও হিমিকা পৌঁছতে পারেনি।

ছয় বোনের মধ্যে বড় হিমিকা। এমন পরিবারে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে হিমিকার বিয়ে হবে এটাই স্বাভাবিক। শর্ত একটাই ছিল ছেলে পক্ষের সঙ্গে মেয়েকে পড়তে দিতে হবে। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি তে স্ট্যান্ড করা মেয়ে খুব ভালোবেসে ফিজিক্সে অ্যাডমিশন নেয়। মাস্টার্স শেষ করতে করতে হিমিকা তিন বাচ্চার মা, গর্বিত কি না জানি না। আমার এখনো মনে পড়ে অনার্স থার্ড ইয়ার ফাইনাল, স্যালাইন হাতে, চার মাসের প্র্যাগন্যান্ট হিমিকা পরীক্ষা দিচ্ছে। কি কষ্টে যে বেচারীর ফার্স্টক্লাস ধরে রাখা । মাস্টার্সের শেষ সাবজেক্টটা যেদিন হলো, তার দু'দিন পরে হিমিকার তৃতীয় বাচ্চা জন্মাল।

কনভোকেশনে হিমিকার সাথে দেখা। অ্যাটমিক এনার্জিতে চাকুরী করছে। বন্ধুর হাত ধরে বলি, কেমন আছিস? কেমন চলছে সংসার? সেই চিরাচরিত ব্যঙ্গের হাসি, 'সংসার'? সংসার না রে, বল্ সঙ সার। কেন?
বন্ধু, পড়া শেষ করে, দুবছর জব করে তারপর নিজের পছন্দে বিয়ে করছ তো আমার অবস্থা কোনোদিনই বুঝবা না। কি দুঃখে সঙ সার বলি! আটবছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে, তুই জানিস এই আটবছরে আমি গড়ে চার ঘণ্টার বেশি রাতে ঘুমাইনি কোনোদিন! দুই-দুইটা স্কলারশিপ মিস করেছি, কমনওয়েলথ স্কলারশিপও। আমার চেয়ে কম নম্বর পেয়ে আতিক চলে গেল। না আমি তখন দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিচ্ছি। মায়ের সংসারে পাঁচটা বোনকে কোলে কাঁখে টানতে টানতে শৈশব- কৈশোর চলে গেছে কখন টের পাইনি। এখন নিজের বাচ্চাদের। শিক্ষিত মা তাই, বাচ্চাদের টিউশন ফি বেঁচে যায়, অফিস থেকে এসে পারিবারিক কোচিং সেন্টার চালাও, খাবারের হোটেল তো আছেই। আমি হিমিকার বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলি।

তোর অমিতকে মনে আছে ন? ঐ যে আমার একই ক্লাশে পড়া চাচাত ভাইটা। আমি মনে আছে বলে সায় দেই। ও লাস্ট মানথে বিয়ে করলো। আমি কি এমন করেছিলাম যে উনিশে পা রাখতেই বিয়ে করতে থুক্কু বসতে হলো!

হিমিকার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।
তোর মনে পড়ে লোচন আমি কোনোদিন ক্যাম্পাসে আড্ডা দিয়েছি? আমার কোনো তারুণ্য ছিল? বলতে পারবি? আমি এখনো সেই ই আছি; অমুকের মা, তমুকের মেয়ে - ভালো লাগে না রে, মেয়ে না হয়ে যদি অন্য কিছু হতাম!

ভেতরে যেতে হবে, মাহাথির মোহাম্মদ সমাবর্তনস্থলে পৌঁছে গেলেন বলে। আমি কনভোকেশনে আসা মেয়েদের দিকে তাকাই। তাকাই মঞ্চের দিকে। কেউ কি জানবে হিমিকা কতকিছু পার হয়ে আজকে এই সামিয়ানার নীচে, কেউ বলবে আমাদের গার্জিয়ানদের নিজের মেয়েকে শান্তিতে লেখাপড়া করার সুযোগটা দিতে?

বন্ধুর চিকচিক করা চোখের দিকে তাকাই, গোল্ড মেডালিস্টদের তালিকায় হিমিকার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। হিমিকা সব প্রতিবন্ধকতা জয় করেছে। স্বীকৃতি হিসেবে গোল্ড মেডেলও পাচ্ছে। শুধু সবাই ক্যাম্পাস বলতে আনন্দ-বেদনার যে মহাকাব্য বোঝে, স্টুডেন্ট লাইফের তরঙ্গায়িত স্মৃতি বহু দিন উষ্ণতা দেয় মনের কোণে সেই জায়গাটা হিমিকার সব সময় ফাঁকা রয়ে যাবে। আমি হিমিকার জন্যে গোপনে দীর্ঘশ্বাস লুকাই। বিদায়ের সময় ও আমাকে বলে যায় আমার মেয়েকে তোর মতো বানাব, নিজের পায়ের নিচে মাটি হবে, তবেই বিয়ে।

➢ সমকাল
নারীস্থান
বর্ষশুরু সংখ্যা
৩ জানুয়ারি, ২০০৬.

গল্পের বদলে আংশিক জীবন

বয়স বাড়ছে, আয়ু কমছে, তারুণ্য টিমটিম করে জ্বলছে। এমন অবস্থায় যখন মন জানে দেশের কোনো জায়গাই দেখা হয়নি তখন একধরনের ব্যাকুলতা কাজ করে। এবার আরামের 'টাইম পাস'- টাইপ ঘোরার বদলে অন্য যাত্রা হবে ভেবে নিয়েই আসন্ন ঈদের আমেজে বাইশে ডিসেম্বর রাতে আটজনের দল যাত্রা করি বান্দরবান। আমাদের টার্গেট কেওক্রাডং।

প্রতিকূলতা পায়ে পায়ে...
রাত দশটায় আসার কথা থাকলেও মাইক্রো এলো রাত সোয়া এগারোটায়। ঢাকা ছাড়ার আগেই শুরু হলো বৃষ্টি। গাড়ি চলে না, চলে না... অবস্থা। যে মাইক্রো আমরা ঠিক করেছিলাম সেটা আসেনি, এসেছে তার দাদা! কন্ডিশন নড়বড়ে। সিটে হেডরেস্টের জায়গা নেই বললেই চলে। পাশের জনের কাঁধই ভরসা। সারাদিনের অফিস শেষে সারারাতের জার্নি, সিটের মাঝখানের জনের মাথা রাখার সুযোগ নেই। কুয়াশা, বৃষ্টি -সব মিলিয়ে শ্লথ গতিতে আমরা পরের দিন সকাল এগারোটায় পৌঁছলাম মিলনছড়ি হিলসাইড রিসোর্টে। বৃষ্টি চলছেই লাগাতার। কেলোর পর কেলো। রিসোর্টে আমাদের বুকিং ক্যানসেলড হয়ে গেছে ঢাকা থেকে যে ছেলেটা বুকিং নিয়েছে তার বেকুবির কারণে। শেষমেষ বুলবুলি নামক এক ঘুলঘুলিতে মেয়েরা চারজন ঢুকলাম (আসলে আটকে গেলাম, রুমটা এত ছোট), ছেলেরা চারজন ডরমেটরিতে জায়গা পেলো কোনোরকমে। পরে অবশ্য দয়াপরবশ (!) হয়ে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ মেয়েদের মুনিয়া-১ এ রাত কাটাতে দিল। আবহাওয়া এতটাই ডিসফেভারে যে তেইশ তারিখ রুমা বাজার থাকার কথা থাকলেও চিম্বুক দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো আমাদের। কুয়াশায় মুভ করা দুষ্কর। রাতে আমরা মন ভর্তি দ্বিধা নিয়ে ঘুমোতে গেলাম কারণ আমাদের ঠিক করা গাইড রতন অন্য গ্রুপ নিয়ে তার আগের দিনই চলে গেছে, আমাদের নতুন গাইড পারেং মুরো। ক্রিসমাসের কারণে আর কাউকেই পাওয়া যায়নি।

ঝাঁকানাকা ঝাঁকানাকা...দেহ দুলছে
চব্বিশ তারিখ সকাল। যান চাঁন্দের গাড়ি। গন্তব্য খক্ষ্যংছড়ি ঘাট। গাড়িতে উঠেই মনে হলো ভাগ্যিস সকালে নাশতা করিনি! এই গাড়ির চালকদের প্রশিক্ষণকালে একটা কথাই সম্ভবত বলা হয়েছে - 'বাছারা, কখনো ডাইনে- বাঁয়ে পেছনে তাকাইবে না, দুই হাতে স্টিয়ারিং ধরিয়া সামনে তাকাইবে। পেছনে বসা যাত্রীরা আছে কি নাই, তাহা তোমাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই। শরীরের পার্টস খুলে ছিটকে পড়িবার দৃশ্য দেখিয়া কী লাভ!'

নাও ভাসাইয়া দে...

খক্ষ্যংছড়ি ঘাট থেকে নৌকা। দু'ঘণ্টা শুধু চারপাশ দেখতে দেখতে যাও। ছইয়ের ভেতর ঘুমাও। কেউ ছবি তুলছে, ভিডিও করছে। মনে নিদারুণ ফূর্তি পাহাড়ে চড়ার ন্যূনতম অভিজ্ঞতা ছাড়াই সাহসে ভর করে আমরা চলছি। নৌকা থামল রুমা বাজারে। লাঞ্চ সেরে শুরু হলো আসল যাত্রা।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু....

বেলা একটা। চব্বিশে ডিসেম্বর শনিবার। আমাদের হন্টনের ইঞ্জিন চালু হলো। প্রথমেই হৃৎপিন্ড হাতে নেওয়ার যোগাড়। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছি না। এই পাহাড় না কি হাজার ফুট উঁচু। অনেকেই প্রকাশ্যে গালি দিচ্ছে নিজের মফিজগিরিকে। ভালোবেসে তানভীর-রুনু, রাকীব-আর আমিও একটা ব্যাকপ্যাক নিয়েছি। তানভীর-রাকীব ভালোবাসার মাহাত্ম্য বুঝছে পিঠের ওজনে। শামীমের চাইতে ওর ব্যাগের ভার নিঃসন্দেহে বেশি। স্বপন, মাবরুকা পারফেক্ট, এখনো ফিট। সবচাইতে হেলদি (দুই মণের একটু বেশি যার ওয়েট) সেই শাবানার ব্যাকপ্যাকই আশ্চর্যজনকভাবে সবার থেকে ছোট। পাহাড়ে ওঠার ধাক্কা সামলানোর পর কেবলই ঝিরি বা ছড়া পার হওয়া। দামি দামি কেডস ভিজে যথেষ্ট ওজনদার। হাফ সেঞ্চুরিবার এই ঝিরি পার হতে হলো। এই হাঁটা আর কোনোদিন ফুরোবে না -এমন মনে হচ্ছে!

পাঁচটা। চারপাশ আঁধার হয়ে আসছে। গাইডের তাড়ায় দ্রুত পা চালানোর চেষ্টা করি। সন্ধ্যার আগেই পা ফসকে শাবানা ঝিরির জলে! বেচারার আগাপাশতলা ভেজা, ব্যাকপ্যাকসহ; হাতের প্রিয় ঘড়িটা ঝিরি গাপ করে দিলো। সন্ধ্যা গাঢ়। টর্চই ভরসা। ভয় পথের কাছে গচ্ছিত রেখে হেঁটে চলেছি। টর্চ দাঁতে কামড়ে আবার উপরে উঠছি। ফুরিয়ে আসছে টর্চের আলোও। অবশিষ্ট টর্চ দুটা, হাফ লিটার খাবার পানি আর কিছু শুকনা খাবার আমাদের সম্বল। গাইড পারেং মুরো কনফিউজড পথ নিয়ে, সে না কি গত দুবছর ঝিরি পথে আসেনি, এসেছে গাড়ি রাস্তা হওয়ার কথা যেদিক দিয়ে, সে পথে। মশাল জ্বালানো হলো পারেং এর সহায়তায়। আমরা ভয় পাচ্ছি এবার একটু একটু। কারণ রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা।

রাত পোহাবার কত দেরি, পাঞ্জেরি

রাত পৌনে নটা। হাতের তালুর সমান একটু সমতল জায়গা পাওয়া গেছে। পারেং কে যতবারই জিজ্ঞেস করা হয় -এখান থেকে বগালেকপাড়া আর কতদূর হতে পারে তার একই উত্তর 'বলা যাচ্ছে না'! যতদূর চোখ যায় আশপাশে ঘন কুয়াশা আর পাহাড়। আমরাও পাহাড়ের উপরে। শাবানার শরীর কাঁপিয়ে জ্বর। সিদ্ধান্ত হলো আমরা এখানেই রাত কাটাব। সকালে পারেং পথ চিনতে পারলে ভালো; অথবা যে পথে এসেছি সে পথে ফিরে যাব। চকোলেট, বিস্কুট আর ওষুধ এই আমাদের রাত্রিযাপনের উপকরণ। সারা শরীরে জোঁক প্রত্যেকের। কুয়াশায় সব ভেজা, কিছু দিয়ে যে আগুন জ্বালব সহজে তারও উপায় নেই। যে সিগারেটের

জন্যে আমরা রাকীবকে বকেছি, রাকীবের জিপপো লাইটারই আগুন জ্বালাতে বড় ভূমিকা রাখলো। মজা করতে করতে একে অন্যকে সাহস দিচ্ছি। আগুন ঘিরে বসলাম। ডিনার করলাম একঢোক পানি, একটা অ্যান্টাসিড, একটা প্যারাসিটামল। সেমিডাবল একটা বিছানার চাদর পাওয়া গেলো শাবানার ব্যাগে। সেটা বিছিয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম ঠান্ডা এড়াতে।

রাত দশটা, তুমুল বৃষ্টি। ব্যাকপ্যাক, ক্যামেরা সব ভিজছে। আমরা তো অবশ্যই। শুধু বিছানার চাদর শাবানার মাথায় ধরে আছি সবাই মিলে যেন ওর গায়ে পানি না পড়ে। ও ততোক্ষণে জ্বরের ঘোরে আবোলতাবোল বকা শুরু করেছে। একটুকরা প্লাস্টিক পাওয়া গেলা যেটা আমরা ওয়েস্ট ব্যাগ হিসেবে ইউজ করছিলাম সেটা কেটে আগুনের উপর ধরা হলো আগুন বাঁচাতে। আগুন না থাকলে এই ঠান্ডায় বাঁচা অসম্ভব। বাঁচব তো আমরা ! হি হি করে কাঁপছি। সবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভেজা। পারেং জান বাজি রেখে এই অন্ধকারে ভেজা গাছের ডাল কেটে আনলো আগুনে দিতে তাও আমাদের পকেট নাইফ দিয়ে। যে যা পারছি আগুনে দিয়ে দিচ্ছি, কাপড়, টয়লেট টিস্যু। টাকা মনে হয় ভালো জ্বলবে এই আশায় পকেটে থেকে যে যার টাকাও বের করে ফেললাম। শুধু আগুনটা থাকুক, আর সবকিছুই তখন আমাদের কাছে তুচ্ছ।

এগারোটা। বৃষ্টি থামল। হাড় কেটে ঢুকে যাওয়া হিম বাতাস। এবারের ট্রিপে 'নো অ্যালকোহল' বলা ছিলো। ওমা হাফ লিটার ভদকা বের হলো মিরাকলের মতো। সবাই দুই এক ঢোক । কাঁপুনি একটু হলেও থামল, গা গরম হলো। সারারাত পালাক্রমে শাবানার শরীর মাসাজ করলাম ওকে উষ্ণ রাখতে। ভেজা সোয়েটার, জুতো, কাদা মাখা আপাদমস্তক নিয়ে আমরা সূর্যের অপেক্ষায় আকাশ পানে।

ভোর হলো। ক্লান্ত, অভুক্ত, শীতার্ত। সকাল সাড়ে ছটায় ফিরতি এক গ্রুপের দেখা। শুনলাম আর বিশ মিনিট গেলেই বগালেকপাড়া পৌঁছতাম আমরা। যারাই দেখছে আমাদের তারাই অবাক, কিভাবে খোলা পাহাড়ে কোন সরঞ্জাম ছাড়া আমরা এই হিমরাতে বাঁচলাম, শাবানাই বা এই ওয়েটের শরীর নিয়ে কিভাবে এই দূরত্ব পাড়ি দিলো।

শেষের কথা, পর্যবেক্ষণ, আমাদের স্বপ্ন

পঁচিশ তারিখ আমরা বগালেকপাড়া থাকলাম। এখানে আমাদের কাপড় ভাড়া করে পরতে হয়েছে বমদের গ্রাম থেকে, একটা সুতাও শুকনো ছিল না আমাদের। এর মাঝে তানভীরের ব্র্যান্ডের গেঞ্জি শুকর খেয়ে ফেলেছে। আমরা মেয়েরা ট্রাইবদের লুঙ্গি পরে এক পাও ফেলতে পারছি না এমন অবস্থা। পরে ট্রাউজারের ফিতা খুলে কোমরে পরে বাঁচোয়া। ফিরেছি ঝিরি পথে নয়, গাড়ি রাস্তা ধরে হেঁটে।

সাতাশের সকালে ঢাকা । এর মাঝে আমাদের আরও ছোট বড় অনেক বিপদ পাড়ি দিতে হয়েছে। যেতে পারিনি কেওক্রাডং! ঈশপের গল্পের মতো এই অভিযান আমাদের একটা শিক্ষাই দিয়েছে -টিমওয়ার্ক যে কোনোকিছু জয় করাতে পারে। মনের জোর থাকলে নারী-পুরুষ কোন ব্যাপার নয়। সবাই সব পারে। আমার

পর্যবেক্ষণ একটাই- ছোট্ট একটা সাইন 'এই দিকে বগালেক' আমাদের যে যাত্রাকে সহজ করতো, তা দিতেও ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

রাকীব-লোচন, তানভীর-রুনু দম্পতি, শামীম-স্বপন বন্ধু, শাবানা-মাবরুকা বান্ধবী জোট আবার বগালেক যাবো এবং কেওক্রাডং অবশ্যই ছোঁব সেবার- এটা আমাদের আটজনেরই স্বপ্ন।

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার
ঈদুল আজহা আয়োজন
১০ জানুয়ারি, ২০০৬

কর্মজীবি নারী ও মাতৃত্ব

পরিবার নিউক্লিয়াস হচ্ছে। এখন পরিবার বলতে স্বামী- স্ত্রী, একটি বা দু'টি সন্তান এবং বুয়া এদেরকেই বুঝায়। সেই সাথে জীবন যাপনের মান, মানুষের সামাজিক অবস্থানের চাহিদা ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করছে প্রতিনিয়ত। এ অবস্থান ধরে রাখতে পরিবারের একজনের উপার্জিত অর্থের উপর নির্ভরতাতে আর চলছে না। সংসারে অর্থনৈতিক সহযোগতিার হাত প্রসারিত করতে, স্বাবলম্বীতার আকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য শ্রেণীর সাথে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরাও ব্যাপক সংখ্যায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন। কিন্তু কেমন থাকেন কর্মজীবী নারীরা যারা বাসায় দুধের বাচ্চা রেখে আসছেন?

চরণে শিকল...

শিউলি। এইচএসসি পাশ করতে না করতেই বিয়ে। পরে বরের উৎসাহে উচ্চশিক্ষা লাভ এবং পরবর্তীতে চাকুরীতে প্রবেশ। চাকুরীতে জয়েন করার আগেই এক বাচ্চা হয়ে গেছে, বাচ্চা স্কুলেও পড়ে। কোনদিক থেকে কোন অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার সময় শিউলি বুঝলেন জীবন কাকে বলে! চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে জয়েন তো করলেন অফিসে কিন্তু বাচ্চা! অফিস কাছে হওয়ায় দুপুরে আধ ঘণ্টার জন্যে বাসায় গিয়ে বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করতেন। কটু কথা কম শুনতে হয়নি এর জন্যে। শুনেছেন। সহ্য করেছেন। বাচ্চার অসুখের সময় চারদিনের ছুটি যখন পেলেন না , ছেড়ে দিলেন জব। "মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার ইমিডিয়েট বস্ এবং কয়েকজন সহকর্মীর আচরণ মনে থাকবে। সবাই কারো না কারো সন্তান। মাতৃত্বকে আমার পায়ের শিকল বানিয়ে, আমাকে কাজ থেকে ইস্তফা দানে বাধ্য করা হয়েছে" - শিউলির ক্ষোভ কাটাব সে সাধ্য নেই।

এক যাত্রায় পৃথক ফল, কেন?

হিয়া তিন দিনের ছুটি নিয়ে মা'র বাড়ি গিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ছুটি অমাবস্যার চাঁদের মতোই রেয়ার আইটেম। যেতে না যেতেই সাড়ে ছ'মাসের বাচ্চার গা ফুটে লাল লাল র‍্যাশ, আকাশ পাতাল এক করা জ্বর। ডাক্তার বললো হাম। হিয়া কাঁদতে কাঁদতে তার রিপোর্টিং বসকে ফোন করলেন। সবশুনে বস্ বিজ্ঞ উত্তর দিলেন - "হিয়া, আপনি ফ্লাইটে চলে আসুন বাচ্চাকে নানীর কাছে রেখে। আমি আপনার ছুটি এক্সটেন্ড করতে পারছি না। হাম এমন কোন বড় অসুখ না।"

হিয়া কোনরকমে সেই যাত্রা চাকুরী বাঁচালেন। পরের সপ্তাহে বসের বাচ্চার জ্বরে বস্ তো এলেনই না, সে সাথে অফিসের সবাইকে মুহূর্মুহূ ব্যস্ত থাকতে হলো বসের

বাচ্চার অবস্থার আপগ্রেড খবর জানতে, ডাক্তার ঠিক করতে। বস্ জয়েন করার পর দু'দিন শুধু বাচ্চার জ্বরে কিভাবে পানি ঢালতে হলো, বরফ দিতে হলো সেই গল্প সবাই শুনল। "বসদের বাচ্চা মানুষের, আমাদের বাচ্চারা কুত্তার" -হিয়া চোখ মোছেন।

সু-সংবাদ, 'সু' নয় যখন

দোলনদের পাঁচজনের ডিপার্টমেন্টে তিনজনই প্র্যাগন্যান্ট। দিন গুণছেন কবে ট্রান্সফার হয়ে যাবেন। তাদের বস, সহকর্মীরা 'ডিমওয়ালা মুরগী' একদম পছন্দ করেন না। হিউমিলিয়েশন কতরকম হতে পারে তা শব্দ চয়নেই বুঝতে পারা যায়।

ব্যতিক্রম, উদাহরণ নয় কেন?

মালিহার বস কিন্তু মালিহাকে গর্ভকালীন সময়ে ডুপ্লেক্স অফিসে ওঠানামাও করতে দেননি। হাঁটার সময়ে 'ওয়াচ ইওর স্টেপস' এই এক বাক্য বলতেন। ম্যাটারনিটি লিভের বাইরে ছুটি, সবার আগে কাজ শেষ হলেই অফিস থেকে চলে যেতে পারা, লাঞ্চে যেন আগে যেতে পারেন সে ব্যবস্থা মালিহার বস করেছেন। " আমি যে এখনো এ রকম কঠিন একটা জব করতে পারছি সে আমার অফিসের সবার সহযোগীতাতেই। প্রথম বাচ্চা, কি যে অবস্থা, সে যার হয়েছে সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।"

টুকরো শব্দ, সমস্যার মেলবন্ধন, প্রস্তাবনা

এখন তো সময় তবু পাল্টেছে, চারমাসের ছুটি পাওয়া যায়। আমি ত্রিশদিনের বাচ্চাকে রেখে জয়েন করেছি- বলে সালেহা বেগম ক্লিষ্ট হাসি দেন। রুবাবা সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ দিন ছুটি পেয়েছেন। নো মার্সি, ছেচল্লিশ দিনের মাথায় অফিস। বাচ্চা দাদীর কাছে, বুকের দুধ বুকেই শুকায়।

সময়ের সাথে হয়তো মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যাপ্তি বেড়েছে। কিন্তু মায়েদের প্রতি কর্মস্থলে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে খুব কম। এমন একটা মা দে না - আমরা বলেই যাই। সেই মায়ের জন্যে আমাদের করণীয় কি কিছুই নেই? 'মা' আধপেটা খাবে কিন্তু স্বাস্থ্যবান বাচ্চা জন্ম দিতে হবে। 'মা' কর্মস্থলে খাটবে, বাসায় গিয়েও শ্রম দিবে। কারণ 'মা'মানেই ত্যাগ। শিউলি, হিয়ার বাচ্চাদের সমস্যার সমাধান হতে পারতো কার্যস্থানে একজন বেবিসিটার, আলাদা একটি কক্ষ। যা প্রতিটা সভ্য দেশে হবার কথা- বৃহত্তর সমাজের সব ক্ষেত্রে নারী ও শিশুকে অঙ্গীভূত করলে শিউলিকে চাকুরী ছাড়তে হয় না। দোলনরা ট্রান্সফারের আতঙ্কে ভোগেন না।

আদর্শ মা, আদর্শ সমাজ দেবেন, মা কে ও তো সমাজের -রাষ্ট্রের কিছু দেওয়ার আছে। সন্তানসহ একজন নারী যখন চাকুরী হারান সেই খড়্গ তার সন্তানকেও কিন্তু নিরাপত্তাহীনতায় ফেলে। মা ও বাবার সম্মিলিত আয় সন্তানকে যেখানে অধিক উন্নত জীবনযাপন দিতে পারতো,তা থেকে সন্তান বঞ্চিত হয়। শিশু যত্ন কেন্দ্র, প্রসূতি সদন এসব গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এই বিষয়ে আমাদের কোন রাষ্ট্রীয় নীতিমালা না থাকায় কর্মজীবী নারীরা তাদের সন্তানদের নিয়ে প্রতিদিন শঙ্কার ঘণ্টা কাটান কর্মস্থলে। ভুলে গেলে চলবে না পুনরুৎপাদনের জৈবিক চক্র পালনের দায় কেবল নারীর নয়। সন্তান উৎপাদন ও পালনের দায়িত্ব সমাজকে, সকল নারী পুরুষ উভয়কে নিতে হবে। না হয় ভালো মা, ভালো সন্তান বুলি হিসেবেই শ্রুতিমধুর হবে, কাজের কাজ হবে লবডঙ্কা।

➢ সমকাল
নারীস্থান
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬.

পুড়ি আমি আগুনে...

এগিয়ে আসছে, এগিয়ে যাচ্ছে, অংশগ্রহণ বাড়ছে-প্রতি বছর ৮মার্চ বিশ্ব নারী দিবস এলে এ শব্দগুলো শুনি নারীদের অগ্রযাত্রা বোঝাতে। ভাবি কিছুক্ষণ, তারপর আপনমনে হেসে আবার ফিরে যাই প্রাত্যহিকতায়।

তিন দফায় প্রায় ১৫ বছর বাংলাদেশ নারী নেতৃত্বে শাসিত। শুনলে মনটা আহ্লাদিত হওয়ার কথা; কিন্তু তা হয় না। কারণ অর্জন খুবই সামান্য। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু এই একমাত্র দান মেয়েদের বিভিন্ন সময়ের শাসকদের। এর মধ্যে শুধু নারী হওয়ার অপরাধে(!) প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। শিক্ষার দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কথা তো অনেক পরের ব্যাপার।

আপনাদের মনে পড়ে সিমি বানু'র কথা? যে মেয়েটি স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। পাড়ার বখাটে ছেলেরা সেই সাধ পূরণ হতে দেয়নি। তাকে বেছে নিতে হয়েছিল আত্মহননের পথ। গাইবান্ধার তৃষা, খুলনার রুমি -কত নাম বলব! আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি মেয়েদের নিরাপদ জীবনযাপন। তবু আমাদের উন্নতির আস্ফালন চলছে। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি-

ঊর্মিরা যখন '৯৩ সালে মিরপুরের বাসায় ভাড়া আসে তখন ওর বয়স ১২। সেই বাসা থেকে ঊর্মির এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স সব পাস করা। একযুগ ওরা এই বাসায় ছিল। সমবয়সী হওয়ার কারণে পাশের বাসার সুমাইয়ার বাসায় ওর অবাধ যাতায়াত। সুমাইয়ার দু'ভাই যথাক্রমে ঊর্মির সাত এবং পাঁচ বছরের বড়। ছোট ভাইয়ের হঠাৎ এত বছর পর মনে হলো ঊর্মি বড় হয়েছে, যাকে প্রেম নিবেদন করা যায়। ঊর্মি অসম্মতি জানাতেই শুরু হলো যন্ত্রণা। ভার্সিটির গেটে, ফোনে উত্যক্ত করা তো আছেই, ঊর্মির বাসার বারান্দায় দাঁড়ানোর স্বাধীনতাটুকুও চলে গেল। উপায়ান্তর না দেখে ঊর্মিরা রাতের আঁধারে ১২ বছরের পাট চুকাল। এমনভাবে গেল যে সুমাইয়া প্রাণের বন্ধুর ফোন নম্বরটা পর্যন্ত পেল না। সুমাইয়া অনেক চেষ্টা করেছে ভাইয়ের এই জালিমপনা বন্ধ করতে, পারেনি। খুব শর্টকাটে একটা ঘটনা বললাম, মনে হবে তুচ্ছ কিন্তু এই চলছে পাড়া-মহল্লা-রাষ্ট্রে সর্বত্র।

সময় গেছে সেই অর্থে আমাদের কোনো কিছুই পরিবর্তনের পজেটিভ দিকে যায়নি। যেখানে মহাকাশে গিয়ে ভারতের নারী প্রাণ দিচ্ছে সেখানে আমাদের মেয়েরা ৩৮ ডিগ্রি গরমে হাত মোজা, পা মোজা এবং কালো বোরকা পরে অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকার কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। হিজাবের সংখ্যা বাড়ছে, নারী নিজেকে ঢাকছে পর্দার আড়ালে সমস্যা এড়াতে।

১৫ বছরে এমন একটা আইন হয়নি যেখানে ধর্ষিতাকে প্রমাণ করতে হবে না সে ধর্ষিত। যে দেশে ইভটিজিংয়ের কারণে ছোট মেয়েদের জীবন দিতে হয় সে দেশে নারীর অগ্রযাত্রা! নারী নেত্রীরা রাজপথ কাঁপাচ্ছেন আরো কাঁপাবেন। সে তুলনায় নীতিনির্ধারণী পদে তাদের অবস্থান শূন্য। বেগম মতিয়া চৌধুরীদের জেনারেশনের পর আর কোনো রাজনৈতিক নারী ব্যক্তিত্ব সামনে আসেননি। দলাদলি আর খায়-

খাতিরের সংসদ অলংকৃত করছেন তারা, যাদের শব্দচয়ন কর্ণকুহরের শ্লীলতাহানি করে। সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব আজো বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা আসলে কতটুকু এগিয়েছি?

গার্মেন্টস কর্মী সামিনা অগ্রযাত্রার (!) উদাহরণ দিয়েছিলেন। নাইট শিফটে কাজ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ১২ টা বাজে। এলাকার আকবর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে প্রতিদিনই রাস্তার রাতজাগা কুকুরটার সঙ্গে সামিনাকে দেখা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। দিন-রাত কাজ করার পর বাসায় ফেরতা এই জ্বালা আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! সামিনা অন্য এলাকার আরেক কারখানায় চলে যান। সামিনার সেই কথা আজো মনে পড়ে-'বুঝলেন আপা, আগে লুঙ্গি পরা বেডারা রাস্তায় শিস মারত, অহন, প্যান্টালুন পিন্দা পোলারা আওয়াজ দেয। দ্যাশের উন্নতি হয় নাই ক্যাডা কয়!'

সামিনারা রাত ভোর কাজ করবে, সিমি বানুরা যে কারো চেয়ে ভালো স্বাবলম্বী হবে শুধু নিরাপত্তাটুকু যদি রাষ্ট্র প্রশাসনের সহায়তায় দিত। নিরাপত্তাহীনতার আগুনে কত স্বপ্ন প্রাণ যে পুড়ে যাচ্ছে। শামীমারা ক্ষুদ্র শিল্পে পুরস্কার এনে বিশ্বের দরবারে মুখ আরো উজ্জ্বল করবে শুধু চলার পথের এই কাঁটাটা দূর করে দিলে। হবে না এ মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি?

➢ সমকাল
নারীস্থান
বিশ্বনারী দিবস সংখ্যা
৭ মার্চ, ২০০৬.

... ইচ্ছে করে মনের কথা কই

মানুষ কেমিস্ট্রির বিবিধ উপাদানের মতো একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত- হাইড্রোজেনের সঙ্গে সালফার ডাই অক্সাইড- ফলাফল! পরিমাণ ঠিক থাকলে সালফিউরিক এসিড। তেমনি নারীর সঙ্গে পুরুষ, তাদের সন্তান পরিবার। সম্পর্ক রচনা করে চলে মানুষ প্রতিনিয়ত। কথা বলতে চায় সে, মনের কথা। শেয়ারিং, কেয়ারিং। তবু তার মাঝে মানুষের মনে এমন একটা স্থান থাকে যেখানে সে একদম একা, অনেকটা 'নো ম্যানস ল্যান্ড'- একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের জায়গা। হতে পারে সে স্থানটা আলোকিত-অন্ধকার- ধূসর। অন্যকে দেখাতে চায় না, বলতে চায় না সেই বোধ তার একেবারে নিজস্ব সম্পদ। নিজের সঙ্গে নিজের কথা প্রত্যেকটা মানুষ বলে থাকে। কেউ তা করতে ডায়রি লেখে। কেউ ব্লগ মেইনটেইন করে। এ কাজ অধিকাংশ মানুষ একটা পর্যায় পর্যন্ত গোপন রাখতেই ভালোবাসে। প্রাইভেসি বলি কিংবা গোপনীয়তা, কারো ক্ষতি না করে কেউ বজায় রাখতে চাইলে তা তার মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। সেটা ক্ষুণ্ন হলে? হতে পারে অনেক কিছুই।

আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই

নাফিসা ছোটবেলা থেকেই উন্নাসিক, চুজি। সামাজিক। সবার সঙ্গে মেশে। কিন্তু সবাই তার বন্ধু হয় না। বাড়ির ছোট মেয়ে। ওদের পরিবার সংস্কৃতিবান। নাফিসা ক্লাস থ্রি থেকে ডায়রি লেখে। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে তার প্রচুর পরিচিত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণে। ছায়ানটে গান শেখা, আবৃত্তি, ভালো ছাত্রী– সব মিলিয়ে রিয়েল চ্যাম্প যাকে বলে। নাফিসা বিয়ের পর আর কখনো ডায়রি লেখেনি। কোনো কবিতা লেখেনি। ওর প্রায় দশ বছরের বড় স্বামী মনে করে নাফিসার ডায়রি পড়াটা তার অধিকার। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, নাফিসার বর অন্যের ডায়রি পড়া যে সভ্যতাবিবর্জিত একটি কাজ (যতক্ষণ ডায়রির অধিকারী তা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক না হয়) তাও মানতে নারাজ। নাফিসা ওর সংসার টিকিয়ে রেখেছে গান না গেয়ে, ডায়রি না লিখে, ছেলে বা মেয়ে কোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে। গোধূলি আলোতে হঠাৎ রাস্তায় দেখা কোনো সুদর্শনের জন্য নাফিসা কোনো কবিতা আর লেখেনি। নিজের একান্ত 'নাফিসা'কে ও একেবারে কবরে গিয়ে দেখবে এমনটাই ভাবে নাফিসা। ও কোথাও ওর মনের কথা লিখে তো নাই-ই, পারতপক্ষে বলেও না।

ডায়রির পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছি...

তুলি দেড় বছর আমাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে। এক পার্টিতে হঠাৎ দেখা হলে চেপে ধরি।

–ফোন করিস না কেন?
: নম্বর হারিয়ে ফেলেছি।
–তোর বিয়েতে আমরা গোটা একটা টেলিফোন ইনডেক্স সবাই ফোন নম্বর আর ঠিকানা লিখে প্রেজেন্ট করেছি আমার মনে আছে।
তুলি ফিকে হাসে। আমাদের নারী মহলে লেপ্টে থাকা ক্যাবলা শওকত তুলির বাসায় বৌ নিয়ে বেড়াতে গেলে যে ঘটনা ঘটে তাই তুলি আমাকে সবিস্তারে বলে। ইউনিভার্সিটির ফেলে আসা দিনের কথা বলতে গিয়ে তুমুল হাসির এক পর্যায়ে তুলি শওকতের হাতে চাপড় দিয়ে বলে ফেলে, 'দোস্ত আর বলিস না। পেট ফেটে মরে যাব।' নাশতা আনতে উঠতে গেলে তুলির বর ইচ্ছা করে পায়ে লাথি দিয়ে তুলিকে ফেলে দেয়। শওকতকে বলে, কী হলো বাপধন, উঠাও তোমার প্রেমিকাকে! টেলিফোন ইনডেক্স ঘেঁটে তুলির বন্ধুদের ফোন করে যা তা বলা তুলি বাসায় না থাকলেই ওর বরের প্রিয় হবি। কতজনের কাছে যে ছোট হয়েছে তুলি সময়-অসময়।
তুলির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাই। 'আমি কিন্তু অসুখী না। ইমতিয়াজ আমাকে ভালোবাসে। আমি জাস্ট শান্তি চাই। এটা ঠিক বন্ধুবিহীন আমার মনের এক পাশটা স্রেফ ফাঁকা বরফ হয়ে গেছে। কিন্তু নিত্যদিনের এসব ঝামেলা ভালো লাগে না। সো, ডায়রির পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছি, যেখানে লিখা ছিল তোদের কথা...'
তুলির গানের সুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। হায় ভালোবাসা, হায় সংসার!

কিউরিসিটি কিলস দ্য র‍্যাট

রিয়াজ মহা আড্ডাবাজ, আমুদে, ছটফটে মানুষ। ওর বউ ঠিক ওর বিপরীত। রিয়াজের দিনের সিংহভাগ কেটে যায় নিজের ব্যবসা দেখতে। রাতে ঘরে ফেরা। কিন্তু বউয়ের প্রতি রিয়াজ মনোযোগী না– এ কথা কেউ বলতে পারবে না। তবু রিয়াজের বউ আশঙ্কায় জর্জরিত। রিয়াজ কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, বললেই দিনের পর দিন মঞ্জুলিকা রিয়াজের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়। যখন-তখন অফিসে হানা দেয়া, মোবাইলের কল লগ, মেসেজ চেক করা, পড়া– মঞ্জুলিকার এসব ব্যবহারে রিয়াজের প্রাণ মোটের ওপর ওষ্ঠাগত। বউকে প্রথম প্রথম রিযাজ বোঝাতে চেষ্টা করত। লাভ হয় না দেখে নিজের ভবিতব্য মেনে নিয়ে রিয়াজ চুপচাপ হয়ে যায়। মঞ্জুলিকা যে রিয়াজের বাসায় রাখা প্রতিটা জিনিস নাড়াচাড়া করে তা বুঝেও না বোঝার ভান করতে হয় রিয়াজকে গৃহশান্তির জন্য। শেষরক্ষা হয় না।
গ্রাম থেকে বিধবা ফুপাতো বোনের আসা নির্দোষ চিঠি রিয়াজ মনের ভুলে প্যান্টের ব্যাক পকেটে রেখে দেয় একদিন। তারপর সেই চিঠি বউয়ের হাতে। কটু কথার বন্যা বয়ে যায়, সেই সঙ্গে সন্দেহের বিষ। রিয়াজ মঞ্জুলিকার কাছ থেকে স্থায়ী মুক্তি, ডিভোর্স নিয়ে নেয় সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রান্ত হলে।

একা বসি সন্ধ্যা হলে, আপনি ভাসি নয়ন জলে...

শতরূপা লেখে। লেখাটা ওর প্যাশন। লেখার প্লট দৈনন্দিনের ডায়রিতেই টুকতে হয় পেশাগত ব্যস্ততার কারণে। শতরূপার বাসায় কোনোদিন কেউ কারো ব্যক্তিগত চিঠি পড়েনি, ই-মেইল দেখেনি। তাই সে ডায়রি লুকানোর প্রয়োজনবোধ করেনি। বিয়ের পরে অনিকের সঙ্গে থাকলেও শতরূপার মনে তার পারিবারিক শিক্ষা। এখানেও সে তার লেখার টেবিলের ওপরই ডায়রি ফেলে রাখে। ড্রয়ারবন্দি করে না, দেয় না তালা। অনিকদের বাসায় সে শিক্ষা নেই। অনিক শতরূপার সবকিছু পড়ে ফেলে। সন্দেহ করে পরকীয়ার। শতরূপা টের পায়।
'পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ-বিশ্বাস যাদের নেই, তারা অন্যের ব্যক্তিগত ডায়রি পড়বেই। তাই বলে কি আমি লেখা থামাব? কখনো না। অনিকের এ কাজ আমার মর্মে লেগেছে। ওর ছোটলোকিতে আমি গোপনে কেঁদেছি। কিন্তু লেখা থামাইনি। জানি না সংসার টিকবে কি না। আমি লিখব।' শতরূপার স্বচ্ছ ভাবনা আমাকে আশ্বস্ত করে। নাফিসার পরিণতি অন্তত হবে না এই মেয়ের লেখালেখির ক্ষেত্রে।
এরকম শত হাজার ঘটনা লেখা যাবে। পড়ার পর সবাই ভুলেও যাবে। আমাদের মনে রাখা উচিত 'এভরিবডি নিডস সামটাইম অন হিজ ওন' (প্রত্যেকের নিজের জন্য সময় প্রয়োজন)। নিজের প্রাইভেসিকে মর্যাদা যেমন দেওয়া দরকার, তেমনি অন্যেরটাকেও। সিভিলাইজড মানুষ হিসেবে অন্যের অনুভূতিকে এ সম্মানটুকু যে দিতে পারে না তার সভ্য জগতে বসবাসের কোনো যোগ্যতাই আসলে হয়নি। কী হবে অন্যের গোপন কথা জেনে? কম জানলে অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ-দ্বন্দ্বও কমে যায় অনেকটাই। ভালোবাসা যেন হন্তাকারক না হয় যাকে ভালোবাসেন তার জন্য, তবেই না আনন্দময় বেঁচে থাকা।

➢ সমকাল
নারীস্থান
২৮ মার্চ, ২০০৬.

উপহার যখন উপহাসের হাতিয়ার

পালা পার্বণে, বিবিধ উপলক্ষে মানুষ মানুষকে শুভেচ্ছা জানায়। বিনিময় হয় ছোটোখাটো উপহারেরও। এ একধরনের ভাবের আদান প্রদান প্রক্রিয়া। সব সংস্কৃতিতেই বিয়ে একটি উৎসব। যে কোনো শ্রেণী নির্বিশেষে এই উৎসবে চলে উপহার প্রদান। শুধু মাত্রা ভিন্ন হয় শ্রেণী ভেদে।

আলেযারা চার ভাই, চার বোন। বোনদের মধ্যে আলেয়া দ্বিতীয়। শহরে বাসাবাড়ীর কাজ করতে করতেই আলেয়া সাবালিকা। অতঃপর গ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং সবশেষে বিয়ে। বিয়েতে ছেলেকে হাতঘড়ি, সাইকেল, ক্যাসেট প্লেয়ার এবং পাঁচ হাজার টাকা দেবার কথা হয়। মিন্নাত আলীর সাথে আলেয়ার কবুল হযে যায়। শুধু ক্যাসেট প্লেয়ারটা দু'মাস পরে দেবে এমন শর্তে মেয়েকে তুলে দেয়া হয় মিন্নাত আলীর হাতে। মাস গড়ায়, হাতের মেহেদী বহু আগেই ফিকে। আলেয়ার মনে লম্বা ছায়া পড়তে থাকে আতঙ্কের। পারে না আলেয়ার গরীব বাবা টেপরেকর্ডার কিনতে দু'মাসের মধ্যে। অতএব আলেয়া বাবার বাড়ী আসে। নিজের শরীরে আরেকজনের অস্তিত্ব নিয়ে আলেয়া বাবার বাড়ি ফিরে আসে। খবর দেয় মিন্নাত আলীকে, লাভ হয় না। আলেয়ার দুরবস্থার কথা জানতে পেরে ও শহরে যে বাসায় কাজ করতো তারা ক্যাসেট প্লেয়ার দিয়ে যান। আলেয়াও ফেরত যায় মিন্নাত আলীর সংসারে। গর্ভের সন্তান, আলেয়া আবার দামী হয়, একটি টেপরেকর্ডারের বিনিময়ে।

সবচেয়ে ভন্ডামি মধ্যবিত্তদের মাঝে।
ভার্সিটিতে অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়ি। এক বন্ধুর ভাইয়ের জন্যে হন্যে হয়ে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে, ছেলে অস্ট্রেলিয়া থাকে। তিনমাসের ছুটিতে এসছে, বিয়ে করে যাবে। বন্ধু খুবই পেরেশান সবকিছু নিয়ে। লেটেস্ট পাত্রীর ছবি দেখে বলি- মেয়েটা তো সুইট, কি পড়ে রে!
পাসকোর্সে বিয়ে পাস করেছে।
সবকিছু মিলে গেলে বিয়ে করিয়ে ফেল্ না। আমার তো ভালোই লাগছে। অন্যরাও আমার কথায় সায় দেয়।
বন্ধুটি বলে, সবই ঠিক আছে কিন্তু ওরা ক্যাশ তেমন দিতে পারবে না। আমার ভাই বিদেশেই থাকবে, ফার্নিচার হাবিজাবি এসব দিয়ে কি করবো? আমার আব্বা ভাইয়াকে অস্ট্রেলিয়া পাঠাতে পড়াতে যে খরচ হয়েছে তার অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাশ হিসেবে ফেরত চান।
মেজাজ ঠান্ডা রেখে জিজ্ঞেস করি, কত দিতে রাজি হয়েছে?
দু'লাখ।
আবার জিজ্ঞেস করি তোদের জন্ম থেকে দুধ-ফুধ যা খাইয়েছে তোর আব্বা হিসেব রাখেনি? আফসোস দোস্ত তুই তো বেশি দামে বিকোবি না, ঢাকা ভার্সিটিতে

পড়াতে তো তোর বাবার তেমন খরচ হয়নি! সবাই খ্যাক খ্যাক করে হাসে। বন্ধুর মুখ একটু ম্লান হয়। এই হলো আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত!
এই ঘটনাটা আরও ইন্টারেস্টিং। ছেলে বিধবা মাকে নিয়ে ঢাকায় ছোট কিন্তু ভালো একটা ফ্ল্যাটে থাকে। ভালো চাকরি করে। ছেলের বিয়ে ঠিকঠাক। সে খুবই চিন্তিত। তার তো বাসা চেঞ্জ করতে হবে শ্বশুরবাড়ি থেকে যা পাবে সেগুলো রাখবে কোথায়? বাসা পরিবর্তন না করার সহজ সমাধান সেসব উপঢৌকন না নেয়া, এই কথা মাথায় আসে না।

গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। বেচারা (!) র দু'মেয়েই একটু শ্যামলা। ছেলে আবার দুধে আলতা। বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। মেয়ের রং এর বিপরীতে বারিধারায় ফ্ল্যাট, মেয়ে একটু শর্ট তাই সিআরভি গাড়ী।

অনেক অত্যাচার, নির্যাতন শ'খানেক মৃত্যুর ইতিহাস প্রতিবছর এই অযৌক্তিক উপহারের দাবিতে ঘটে যাচ্ছে। আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না। এ বিষয়ক কৌতুক শোনেন একটা -
ফয়েজ সাহেব একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেকে ঘরে বাইরে সাজিয়ে দিয়েছে পাত্রীপক্ষ। সেই ফয়েজ সাহেব হঠাৎ করে যৌতুক বিরোধী কথাবার্তা বলছেন। জনমত গঠনের চেষ্টাও চালাচ্ছেন। কারণ তার বিবাহযোগ্য মেয়ে তিনটি।

আমরা না কি অনেক ধার্মিক, ধর্মভীরু জাতি। মেয়েদের পর্দা করার জন্যে অনেকে জান কোরবান করে ফেলছেন। যৌতুকের ঘূর্ণিচক্রের বিরুদ্ধে ধর্ম পালনকারীরা কিছু বলেন না। নবীজী কন্যা ফাতেমা (রাঃ) এর বিয়েতে আপ্যায়ন করা হয়েছিল খেজুর দিয়ে। স্ত্রীকে গ্রহণ করার আগে দেনমোহরের ফয়সালার একটা ব্যাপার আছে কিন্তু কোথাও এইসব দেওয়ার বিধান দেওয়া নেই। এক একটা মেয়ে তাদের কতবছরের জীবন ফেলে আরেকজনের পরিবারে আসে। বাবা-মা কলিজা ছেঁড়া সন্তানকে কবুল বলা পুরুষের হাতে তুলে দেয়। তার মূল্য কি একটা ক্যাসেট প্লেয়ার, নগদ অর্থ কিংবা ফ্ল্যাটেই নির্ধারিত হয়ে যাবে?

➢ সমকাল
নারীস্থান
৯ মে, ২০০৬.

তারপরও কেন এই ভোগান্তি?

জীবিকা নির্বাহের চক্করে মানুষ হারিয়ে ফেলে তার জীবনের স্বর্ণালী সময়ের অনেকটাই। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর দেখেন পরিবারের সদস্যদের সাথে অনিচ্ছাসত্বেও সৃষ্টি হয়েছে এক অমোচনীয় দূরত্ব, যাদের ভরণপোষণের জন্যে এমন জীবন বেছে নিয়েছিলেন তাদের সঙ্গেই হারিয়ে ফেলেছেন যোগাযোগের ভাষা। তবু ব্যবসা চাকরি যে কোন একটা করতে হয়। দেশে প্রচলিত অনেক পেশার মধ্যে এখন ব্যাংকিং সবচেয়ে লোভনীয়। আগের তুলনায় অনেক বেশী নারী এখন এই পেশার সঙ্গে জড়িত। সরকারি-বেসরকারি-বিদেশীসহ বর্তমানে দেশে মোট ব্যাংকের সংখ্যা চুয়ান্ন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকর্মী এর সঙ্গে জড়িত। তাদের পেশার আংশিক একটা চিত্র তুলে ধরেছেন **লেখক**

চাকরিও ছাড়া হয়ে ওঠে নাঃ
শাওন বেসরকারী ব্যাংকে আছেন এক যুগ। এরমধ্যেই তার বিয়ে, দু'বাচ্চা। বরও একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার সুবাদে দু'জনের বনিবনার কোন সমস্যা কখনো হয়নি। তবে তার মতে ব্যাংকের চাকরি আবার তা যদি বেসরকারি ব্যাংকে হয় তাহলে অনেক সময় তা প্রাণঘাতীও হয়ে দাঁড়াতে পারে। শাওনের দ্বিতীয় বাচ্চা ছ'মাস বয়সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। সদ্য মেটার্নিটি লিভ্ ফেরত শাওন সেই সময় কোনো ছুটিও পান না। প্রতিদিন বাসায় ফিরতে সাতটা বাজে। বাচ্চার সঠিক যত্ন স্বাভাবিকভাবেই শাওনের নেওয়া হয়ে ওঠে না। তৎকালীন যে বস্ তার ছিল তাকে তিনি একদিন আগে চলে যেতে দেওয়ার অনুরোধ জানান বাচ্চার হাই ফিভারের কথা বলে। জবাবে বস্ বলেন যে জ্বরে কেউ মারা যায় না। শাওনের বাচ্চা মারা যায়নি ঠিকই কিন্তু শিকার হয় এক চিরস্থায়ী ক্ষতির। বাচ্চা আজীবনের জন্যে শ্রবণ ক্ষমতা হারায়। " নয় বছরের বাচ্চাটার দিকে তাকালে আমার যে অপরাধবোধ হয় তা আমাকে আমৃত্যু তাড়িয়ে বেড়াবে। শুধু ভাবি আমার মতো খারাপ মা বোধহয় এ জগতে আর নেই।" বাচ্চার চিকিৎসা বাবদ প্রতি বছর কয়েক লাখ টাকা লাগে। সেই ঋণের ফেরে পড়ে শাওনের আর চাকরিও ছাড়া হয়ে ওঠে না।

বাবার কথা কতটা সত্যঃ
তিনবছর হয়ে গেল তাজিনের ব্যাংকিং সেক্টরে। এরই মাঝে বাধ্য হয়ে দুটি ব্যাংক কাজ করেছে। প্রথম ব্যাংকে তাজিনের পারফরমেন্স ছিল ঈর্ষণীয়। যখন ব্রাঞ্চে জয়েন করে মাঝারি মানের শাখাটাতে তেমন কোন টার্নওভার ছিল না। এভারেজ। কাউন্টেবল কিছু না। দু'বছরের মধ্যে তাজিন পুরো ব্যাংকের সব শাখা মিলিয়ে সবচাইতে বেশি ডিপোজিট আনে। বাড়ায় লোন ক্লায়েন্ট। ওর সার্ভিসে ম্যানেজার থেকে শুরু করে এমডি পর্যন্ত মুগ্ধ হন। তাজিন এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ লাভ করে বেস্ট ব্যাংকার অ্যাওয়ার্ড, কয়েকটা পারফরমেন্স বোনাস। ওর শাখা প্রথম হয়

পর পর দু'বছর। ম্যানেজার সেই ব্রাঞ্চে তিনবছর কিন্তু তাজিন আসার পর তার এই সাফল্য। তাজিন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ভুল করেন এক জায়গায়। ম্যানেজারকে তার পাসওয়ার্ড ইউজ করতে দিয়ে দেন। অনলাইন এবং সেন্ট্রালাইজড ব্যাংকিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাজিন এবং তার আরও পাঁচজন সহকমীর সরল এবং পরম নির্ভরতার সুযোগে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যা করার তাই করেন। ঘাপলা ধরা পড়লে প্রথমে চলে আভ্যন্তরীণ অডিট তারপর বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিট। তাজিনদের ছয়জনের বিরুদ্ধে শুধু পাসওয়ার্ড দেয়া ছাড়া আর কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও তাদেরকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সেই ম্যানেজার চাকরি হারান এটাই ছিল তার একমাত্র শাস্তি। তিনি তহবিল থেকে গ্রহণকৃত টাকা ফেরত দিয়েই খালাস পেয়ে যান, সেই ব্যাংকের ডিএমডির ছেলেবেলার বন্ধু হওয়াতে। তাজিন পরিণত হন হিরো থেকে জিরোতে। ইতিমধ্যে ব্যাংক পাড়ায় ঘটনা চাউর হওয়াতে বেশ অনেকদিন বসে থাকেন কাজবিহীন। "নরমাল দিনেও কোনোদিন সাতটার আগে অফিস থেকে বের হইনি। ইনভেস্টিগেশনের সেই তিনমাস রাত বারোটার আগে একদিনও বাসায় আসিনি। সাহিত্যের ছাত্রী যখন ব্যাংকিং এ মেজর নিয়ে এমবিএ করছি তখনই আমার বাবা বলেছিলেন, মা রে জানিস তো ব্যাংকার এন্ড ড্রাংকার কামস লেইট! ব্যাংকারদের কোন পার্সোনাল লাইফ থাকে না। বেসরকারী হলে তো কথাই নেই। এখন বুঝি বাবার কথা কতটা সত্য।" তাজিন চাকরিচ্যুত হওয়ার পর প্রাপ্য অর্থও অনেক ভোগান্তি পেরিয়ে বহুমাস পর হাতে পান। নতুন যে ম্যানেজার বিদেশী ব্যাংকের সিল শরীরে নিয়ে এসেছেন তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যাতে এই ছয়জন সহজে তাদের টাকা না পায়। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশ ছিল এমডি, ডিএমডিসহ উচ্চপদস্থ কয়েকজনকে যেন অপসারণ করা হয়। অসাধু মানুষদের কর্মের খেসারত দেন এই নবীন ব্যাংকার আরো পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে এভাবে।

'এজন্যই আমি মাইয়াগোরে...':

যে কোনো পরিস্থিতিতে হাসতে পারা- এ গুণই নায়লাকে ব্যাংকের মতো জায়গায় টিকে থাকতে সাহায্য করছে বলে নায়লার বিশ্বাস। নায়লা হাসতে হাসতে যেসব কথা বলেন তা হাসি ফুরোলেই বুঝতে পারবেন কতটা মর্মান্তিক সত্য। নায়লার কথা তার বয়ানেই শুনুন-

সাতজন ম্যানেজারের আন্ডারে আমি কাজ করেছি চাকরির আটবছরে। একজন যখন কয়েকজনের উপর ছড়ি ঘোরানোর অধিকার পায় তখনই এদের চেহারা যায় পাল্টে । দু'দিন ছুটি মানে শুক্রবার -শনিবার তাও প্রায়ই অফিস করতে হয়। পুরো মাসে এক শুক্রবার বাসায় থাকতে পেরেছি এমন রেকর্ডও আছে। শনিবার তো অনেক দূরের ব্যাপার। ছুতোনাতা ধরে ডেকে আনবে। মনে করেন মঙ্গলবার বোর্ডমিটিং, সেইদিন কি খাওয়ানো হবে তার লিস্ট তৈরী করতে আপনাকে শুক্রবার সাড়ে ৮টায় অফিসে নিয়ে এলো, বস্ আসলেন বারোটার দিকে, তারপর জুমায় চলে গেলেন, আপনি বসে আছেন। বাসায় আপনার বাচ্চা হা করে কাঁদছে। বলেন বাচ্চার কথা, উত্তর আসবে, আঞ্চলিক ভাষায় - এইজন্যই আমি মাইয়াগোরে কাজে

নিতে মানা করি। যেন তিনি জন্ম থেকেই এমডি, কোনোদিন কোনো মায়ের বাচ্চা হিসেবে বড় হননি অথবা তার মা ব্যাটাছেলে ছিলেন! দু'দিন বন্ধ রাখার দরকার কি? সাতদিনই খুলে দিক। জানব এটাই আমার চাকরি করার কন্ডিশন। বুইড়া খাটাসরা একেকটা ভাব করে যেন বন্ধের দিন অফিস করলে কয়েক কোটি টাকা লাভ বাড়বে। অনেক বস্ই বোঝেন না সবাই কম-বেশি বেতনের চাকর। যতকিছুই করুক ব্যাংকের মালিক হতে পারবে না। আর মেয়েদের অবস্থা আরো খারাপ, পারবে কেউ এমডি হতে? বড়জোর এসইভিপি এতটুকুই যেতে দেয়া হবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অলিখিত নিয়ম এটা।

কাজের মেয়েকে যতটা চেনে...:

'কম লোক রাখবেন, খরচ কম। পাঁচজনের কাজ দু'জনকে দিয়ে করাবেন। লাভের ওপর লাভ।' এ কথা আমার না এক নারী ব্যাংক কর্মকর্তা মারিয়ামের কথা। আরো কথা- এটাই না কি পদ্ধতি। কন্টিনিউয়াস স্ট্রেসের মধ্য দিয়ে যাবেন। লোকবল কম। এখন চাকরির যে বাজার তাতে পাঁচ হাজার টাকায় আপনি এমবিএ করা ছেলে -মেয়ে পাবেন। ইচ্ছে হলে কাজ করেন না করলে নাই। কত বছর যে বিকেলের আলো হাওয়ায় দম নেই না তা সৃষ্টিকর্তাই জানেন! তারপরও শুনবেন ইনএফিসিয়েন্ট, ঠিকমতো এফোর্ট দিচ্ছেন না। নয় মাসের বাচ্চাটাকে সকালেও ঘুমে পাই, বাসায় রাত নয়টায় ফিরেও দেখি ঘুম। কাজের মেয়েকে যতটা চেনে মা হিসেবে আমাকে তার চেয়ে অনেক কম চেনে। গতবছরও আমার সাতদিন ক্যাজুয়াল লিভ নষ্ট হয়েছে।

বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে আমার দেখতে পাচ্ছি যে কোনো শ্রম আইন মানা হয় না।

আন্তর্জাতিক লেবার ল' অনুযায়ী আট ঘণ্টা খাটুনির পরে কাউকে খাটালে তার জন্য উপযুক্ত ওভারটাইম দিতে হবে। এক ব্যাংকে দেখা গেল এই ওভারটাইমের পরিমাণ পঁচিশ টাকা। এ কি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান? অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে অনেকেই অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছেন। মারিয়ামের বক্তব্য অনুযায়ী আমার এ রিপোর্ট কোনো পরিবর্তন কোথাও ঘটাতে পারবে না। একবাক্যে প্রত্যেক পুরুষ কর্মকর্তাই স্বীকার করেছেন নারীরা ব্যাংকিং পেশায় পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি মনোযোগী এবং সৎ। তারপরও কেন তাদের এই ভোগান্তি?

➢ সমকাল
নারীস্থান
২৩ মে, ২০০৬.

ফুটবল স্পিকস্

প্রত্যেক পত্রিকার সাথে রঙিন পাতা, বিশেষ ক্রোড়পত্র। ভালো লাগে সত্যি কথা। গত বছর দশেকের ব্যবধানে দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাসহ ম্যাগাজিনগুলোর ছাপার মান দারুণ উৎকর্ষ লাভ করেছে; পত্রিকার স্টলে অনেকের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে পাতা উল্টোতে উল্টোতে তাই ভাবে ইসাবেলা। বাহারি সব পোস্টার। কারণ আর কিছু নয় ফুটবল বিশ্বকাপ ২০০৬। খেলোয়াড়দের বল পায়ে বিচিত্র সব ভঙ্গিমা। এক মাস সবকিছু থেকে মুক্তি। টিভি খুললে ক্লান্তিকর মেগাসিরিয়ালের সালশা বাধ্যতামূলকভাবে গিলতে হবে না। এসব চিন্তা করতে করতে ইসাবেলা রোনালদিনহোর একটা পোস্টার কিনে ফেলে। বাসায় ফিরে পোস্টার সেট্ করার ফাঁকে ইসাবেলার মন ছুটে যায় বিশ বছর আগের এক বালিকার স্মৃতি বারান্দায়।

ফুটবল, ফুটবল দূরন্ত ফুটবল...

ছিয়াশি, বিশ্বকাপ ছিয়াশি। ম্যারাডোনাকে নতুন করে আবিষ্কারের বছর। থ্রিতে পড়া বালিকা সাদাকালো টিভিতে বিটিভি'র বদৌলতে কিছু খেলা দেখে আর থেকে থেকে ঘুমে ঢুলে। তবুও খেলা দেখা চাই, দরকার হলে চোখে লেবু ঘষবে তবু খেলা মিস্ করা চলবে না। এমন সঙ্কল্পে মন স্থির। ভাইদের সাথে পাল্লা দিয়ে ফুটবল খেলে। কোনরকমে দু'টা শব্দ মেলাতে পারলেই কবিতা হয় ভেবে হোমটাস্কের খাতায় লিখে ফেলে "বিশ্বকাপে জিতবে কে?/ আর্জেন্টিনা ছাড়া আর কে?/ যদি জেতে ব্রাজিল/ করব আমরা মিছিল"। 'প্রতিবাদ মিছিল' শব্দটা তার ভান্ডারে তখনো যুক্ত হয়নি। যাক্ সে মিছিল আর করতে হয়নি। আর্জেন্টিনা বীরদর্পে সে বছর জিতে যায়। ম্যারাডোনা পরিণত হয় ফুটবলের মহানায়কে। তখন বন্ধুদের একমাত্র প্রতিযোগীতা ছিল কে কয়টা ম্যারাডোনার ছবিযুক্ত খাতা কিনতে পেরেছে। পায়ে কাঁচ ঢুকে রক্তারক্তি তবু খেলার বিরতি নেই। এ্যাংলেট কোথায় কিনতে পাওয়া যায় তার জন্যে বড় ভাই এর জান নাকাল করে দেবার বছর ছিল সেটা। নিয়মিত পাম্প দিয়ে বল ঠিক রাখার বছর ছিয়াশি সাল। বৃষ্টি হলে পাড়ার ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে জোট বেঁধে বল নিয়ে পানিতে দাপানোর সেই নাইনটিন এইটি সিক্স...ভাই গান মুখস্থ করায় - ফুটবল, ফুটবল, দূরন্ত ফুটবল, চারিদিকে ফুটবল নাম শুনি, গোল, গোল...

দেশে, বিদেশে

বিশ্বকাপের ফেরাটা অনেকটা লিপইয়ারের মতো। চারবছর পরে একবার। দেশী ফুটবলের উন্মাদনা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। লীগ পর্যায়ের খেলা চলছে, বাজি ধরে জমানো সবেধন পাঁচ টাকা হারানোর শোকে কেঁদেছে কত না ঘণ্টা। বাসার সবাই মোহামেডান। শুধু বাজি ধরার স্বার্থে একদল হয়ে গেল সাময়িক

আবাহনী কিংবা ব্রাদার্স। ব্যস ধুন্ধুমার। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইসাবেলার যৌক্তিক মন দেখেছে ব্রাজিল ফুটবলটাকে শিল্পী যেমন তুলির আঁচড়ে ছবি আঁকে তেমন নান্দনিকতার সাথে পেশ করে। ও দল পাল্টেছে। আগে বড় ভাই ছিল এসবের গুরু। এখন নিজের ভোট নিজে। প্রিয় তিনটা গল্পের বই এর বিনিময়ে 'মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' লেখা মনোগ্রাম সংগ্রহ করেছিলো এক বন্ধুর কাছ থেকে। এই ছড়া তো সে সময়ের সবার জানা - 'ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা, বোয়াল মাছের দাঁড়ি, আবাহনী ভিক্ষা করে মোহামেডানের বাড়ি'। খেলোয়াড় যে দলেরই হোক ভালো খেলোয়াড়দের নাম এখনো মনের আনাচে কানাচে ঠিকই ঘোরে - কানন, কায়সার হামিদ,মুন্না, জনি, আসলাম; তাদের স্মৃতি মনে ঝঙ্কার তোলে যারপরনাই। কোথায় হারিয়ে গেছে ফুটবল, আবাহনী - মোহামেডান - ব্রাদার্স - মুক্তিযোদ্ধা! অচর্চায়, অবহেলায় গতিময় এ খেলার গতি আজ রুদ্ধ। ইসাবেলা কি ভুলতে পারবে ২০০২ সালে করা ওর মায়ের সেই গগনবিদারী চিৎকার? বিশ্বকাপ ২০০২ শুরু হতেই মাথার দীঘল কেশরাশি সরিয়ে রোদ পিছলানো টাকের অধিকারী ইসাবেলা ব্রাজিলের সম্মানে। পরিচিতদের অজ্ঞান হবার যোগাড়, ইসাবেলা নির্বিকার।

... ফিরিয়ে আনা যায়?

ইসাবেলা জানে যা যায় তা ফেরানো যায় না। মানুষ শুধু পুরনো স্মৃতিকে রোমন্থন করে তার কাছাকাছি কিছু নির্মাণের ক্ষমতা রাখে। এদেশের একেবারে নবীন প্রজন্ম ক্রিকেটকে যতটা চেনে তার সিকিভাগও ফুটবলকে চেনে না। ইসাবেলার পাশে বসা ভাগ্নে ফুটবল খেলা বোঝে না সাত বছর বয়সেও । চেনে না আবাহনী - মোহমেডান। জানে না কলকাতার মোহনবাগান নামের কোন টিমকে। খেলার মাঠ নেই।

সুস্থ বিনোদনের এই মাধ্যমকে কি কোনোভাবেই আবার জীবিত করা যায় না? আফগানিস্তানের মতো যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশেও ফুটবল দল আছে, পাচ্ছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। তারা যে স্বাভাবিক জীবন চায় অন্য সবারই মতো সেই বার্তা বিশ্বের দরবারে আফগানিস্তানের হয়ে বলে গেছে তাদের ফুটবল দল এশিয়ার বাছাই পর্বে।

যদি চাঙ্গা হতো প্রিয় এই খেলা তাহলে হয়তো গায়ক তপন চৌধুরীও দেশে ফিরতেন, সব অভিমান ভুলে আবার গাইতেন - "ফুটবল, ফুটবল...চল ভাই মাঠে যাই, বেলা বয়ে যায়..."। কোকের নতুন বিজ্ঞাপনটার মতো সংসদ, রাজপথ সব ঠান্ডা করে দিত ফুটবল! ইসাবেলা চিন্তা করে কবে আসবে সেইক্ষণ যে ক্ষণে সত্যিই ভাবা যাবে **উই অল স্পিক ফুটবল**!

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার : বিষয়- বিশ্বকাপ
৪ জুলাই, ২০০৬.

নারী কিংবা পুরুষ নয়, মানুষ করে তুলুন

অফিস সৌভাগ্যক্রমে বাসার এতটাই কাছে যে লাঞ্চে আধা ঘণ্টার জন্য বাসায় আসতে পারি। বেশিরভাগ দিনের দুপুরই জন্ডিস রোদে ঝলসে যায়। আমার রোদে এলার্জি আছে। তাই ক্যাপ আর রোদ চশমা নিত্যসঙ্গী। আমাকে যারা জানে তারা সবসময় হ্যান্ডব্যাগের পাশে ঝোলানো একটা ক্যাপ দেখে অভ্যস্ত। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কলিংবেলে হাত। চৌদ্দ-পনেরো বছরের দুই কিশোর কিছু বলে গেল আমার ক্যাপ এবং সানগ্লাস নিয়ে। মা অফিসে যাননি, ছুটিতে ; বারান্দা থেকে লক্ষ্য করেছেন ছেলে দুটোকে এবং তাদের অঙ্গভঙ্গিও। আমি কিন্তু শুনিনি এবং সচেতনভাবে দেখিওনি। "আমি আটাশ বছরের বিবাহিত নারী, মাকে হাসতে হাসতে বললাম, এসব আমি দশ বছর বয়স থেকে মোকাবেলা করে আসছি। এখন এইসব মন্তব্যে-হাসিতে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। রাস্তায় বেরোলে নিজেকে পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করার প্রক্রিয়া এতবছরের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছি।"

এই দেশে স্বপ্নাদের মৃত্যুই শ্রেয়। নিউজকাস্টাররা পাতা ভরে ২-৪ দিন লিখবে, এর বেশি আর কী! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি মেয়েদের পথচলার বেদনা। মানসিকভাবে শক্তিশালী না হলে প্রতিদিনই আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগবে। কতজন মরে গেল শুধু বখাটেদের নিপীড়নে! দেশের প্রশাসনযন্ত্র থেকে একবারো বলেনি আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে যে আইন তা সংস্কার করা হবে। কেউ বলবেও না। এ আইন সংস্কার কি ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে কোন ভূমিকা পালন করবে? না। ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাইরে যারা তাদের পকেট কি ভারী হবে? না। কীট পতঙ্গের জীবন যাদের তাদের সবচাইতে অবহেলিত অংশ 'নারী' সেই অংশ হয়তো একটু স্বস্তিতে বাঁচার আশ্বাস পাবে এই আইনের সংস্কার হলে।

ইভটিজিং অনেক মোলায়েম শব্দ। পাড়ায় পাড়ায় তথা দেশের সর্বত্র সমাজবিরোধীরা যে আচরণ নারীর প্রতি করছে তা আসলে সোজা বাংলায় নারী নির্যাতন, মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। যার যায় সে জানে। সিমির পরিবার জানে তারা কি হারিয়েছে। স্বপ্নার পরিবার জানে, জানবে প্রাত্যহিকতার আড়ালে তারা কি হারিয়েছেন। সাময়িক মিটিং মিছিল, পত্রিকার পাতায় কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ কিংবা আমার মতো কলমপেষকদের কলামে এই সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান কখনোই হবে না।

বাংলাদেশের নারীমাত্রই জানে পথ-ঘাটের ভোগান্তি কি জিনিস! পারিবারিক পর্যায়ে পুরুষকে মানসিকভাবে সংশোধিত করা না গেলে, সামাজিক প্রতিরোধ যেমন এসিড সন্ত্রাসের প্রতি গড়ে তোলা হয়েছে তেমন প্রতিরোধ গড়ে না তুললে এবং সর্বোপরি কঠোর আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ না হলে 'সিমি থেকে স্বপ্না' এই যাত্রায় শুধু নামই নিবন্ধিত হবে। নারীর প্রতি রাষ্ট্রের কোনো কর্তব্য নেই - তানিয়া ধর্ষণ মামলার আসামীর বেকসুর খালাস প্রাপ্তি তাই প্রমাণ করে। অনেক ইস্যুতেই রাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছে না। সেসব খাতের কাজ ঠিক পথে চালিত করতে সরকারকে বাধ্য করার দায়িত্ব জনগণের। আপনার মেয়েকে বাঁচানোর

দায়িত্ব আপনারই। শিশুকে নারী কিংবা পুরুষ নয়, মানুষ করে তুলুন। নিজেকে নিজে রক্ষা করার ক্ষমতা যেন আপনার মেয়ে শিশুটি অর্জন করতে পারে তাকে সেভাবে মানসিক সাপোর্ট দিন। সমস্যার আবর্ত অনেকখানি হ্রাস পাবে। একদম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথাগুলো বললাম। চর্চা করলে লাভবান হবেন, ক্ষতিগ্রস্ত নয়।

➢ সমকাল
নারীস্থান
৮ আগস্ট, ২০০৬.

ইসাবেলার নাইওরি

'কে যাস রে ভাটি নাও বাইয়া, আমার ভাইয়েরে কইয়ো নাইওর নিত বইয়া'– গানটি এমনই তো মনে হয়। গানের কথা আর আগের মতো মনে থাকে না ইসাবেলার। গান শোনার সময়ই বা কোথায়! এখন শুধু দে দৌড়। গত দশ-বারো বছরে নিজের বাবা-মাকে ঈদের সালাম ঈদের দিন করে উঠতে পারেনি, ভাই-বোন তো অনেক দূরের ব্যাপার। নিজেকে বুঝিয়েছে, এটাই নিয়ম। অতএব, বহুদিন পর ঈদের পরদিন বাবার বাড়ি যেতে পারা সৌভাগ্য ছাড়া আর কী! রাস্তায় জ্যামে আটকে বাসে বসে বসে এসবই ভাবছে ইসাবেলা। জাকাতের কাপড় কিনতে বের হয়েছে। মার্কেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

রাতে মাত্র দু ঘণ্টার জন্য ইলেকট্রিসিটি এসেছিল, ঘুমের দফারফা। সেহরি খাওয়া যায়নি ঠিকঠাক। কেমন জানি অবসাদ লাগে ইসাবেলার। এই অক্টোবরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা না কি ৩৪ ডিগ্রি! তাপমাত্রারও উন্নয়ন ঘটেছে বলতে হবে। ও নিজের মনেই হাসে। একটা ইউপিএস কেনা জরুরি, কিনতে পারছে কই! ভদ্রলোকের অনেক হ্যাপা, পেটে ক্ষুধা থাকলেও বলার জো নেই। পেটে-বুকে পাথর বেঁধে স্বাভাবিকতার অভিনয় করতে হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর ওদের তিনজনের সংসারে যা থাকে তা নিয়ে আর যাই হোক ঈদ উপলক্ষে বিশেষ মউজ করার কোনো অবকাশ থাকে না।

অজগরের লেজে সামান্য দোলা লেগেছে, বাস নড়ছে। অবশেষে মার্কেটে পৌঁছে ইসাবেলা। মানুষ ছুটছে। আঁতকে উঠছে কেউ কাপড়ের দাম শুনে। কেউবা নির্বিকার কিনে নিচ্ছে। যে টাকা নিয়ে এসেছিল ইসাবেলা তাতে পাঁচটার জায়গায় তিনটা শাড়ি কিনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মিনার এ নিয়ে তিনবার ফোন করেছে বাসায় কখন যাবে জানতে। এখান থেকে বের হলে সিএনজি ট্যাক্সিচালকরা মিটার নামিয়ে রাখবে, বলবে চুক্তিতে যাবে। বাসের জন্য কিউতে কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে তা ভাগ্যই বলতে পারে।
জমজমাট মেলা মানুষের। গায়ে গা লাগানো ভিড় দেখে ইসাবেলার ভালো লাগে। এটাই তো বেঁচে থাকার টনিক। পরিস্থিতি যাই হোক আনন্দের সময়টুকুতে যোগদান করা। ঈদ তো সে আনন্দই। দেয়াল লিখনে চোখ পড়তে ওর ভাবনা ডানা ঝাপ্টাল্টায়। 'নারীদের ঈদগাহে কিংবা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া হারাম'-প্রচারে আল-বাইয়্যিনাত। ঈদের জামাতে ইসাবেলা কখনো যেতে পারেনি কিন্তু ছোটবেলায় ওরা সবাই ঈদগা মাঠ পর্যন্ত যেত। এ এক অন্য আনন্দ। মহানবীর (সাঃ) জমানার নারীরা ইমামতিও করেছেন, করেছেন যুদ্ধ। এখন ইসলামী সভ্যতার ধ্বজাধারীরা সবই নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে নিজেদের সুবিধামতো।

ত্রিশ মিনিটের দূরত্ব দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম করে ক্লান্ত-শ্রান্ত ইসাবেলা অন্ধকার ঘরে ঢোকে ভাগ্যকে অভিসম্পাত করতে করতে। বিদ্যুৎ নেই। গরমে নেতিয়ে ওর দু

বছরের লিমিন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাওয়ার সেক্টরকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণের জন্য কী অভিনব চাল! যত যাই হোক গিলোটিনে মাথাটা ইসাবেলাদের মতো নিরীহ মানুষেরই দিতে হচ্ছে। দু বছরের বাচ্চাকে নিয়ে একটা চলন্ত ফ্যানের নিচে নিরুপদ্রব ঘুমের ছোট্ট স্বপ্নও পূরণ হয় না। ভাবনায় ছেদ পড়ে। মিনার বাথরুম থেকে বের হয়।
–একটা ভালো আরেকটা শকিং খবর আছে।
ইসাবেলা মিনারের দিকে মনোযোগ দেয় –কী?
–আমার হংকংয়ে ট্রেনিংটা হয়েছে। নেক্সট উইকে যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে ঈদে থাকতে পারব না।
ইসাবেলা মনের আনন্দ গোপন করে মন খারাপের সুনিপুণ অভিনয় করে। ওর মন খারাপের বহর দেখে মিনার বলে ফেলে, 'আমার মনে হয় তুমি এবার তোমাদের বাসায় ঈদ করলে ভালো করবে। আম্মাও তো মামার বাড়ি চলে যাচ্ছেন। তুমি লিমিনকে নিয়ে একা একা... তারচেয়ে লিমিনের নানাবাড়িই যাও।'
ইসাবেলা নাইওরে যাচ্ছে না; কিন্তু ওর তেমনই লাগছে। লিমিন ওর মামার কোলে, ইসাবেলা গাড়িতে ওঠে। কত বছর পর ঈদের ভোরে মায়ের চুমুতে ওর ঘুম ভাঙবে! অতীতকে আবার কাছে পাওয়ার জন্য ইসাবেলা মনে মনে বলে, ঈদটা একটু তাড়াতাড়ি হোক, ঊনত্রিশ রোজাই যথেষ্ট।

➢ সমকাল, সুহৃদ সমাবেশ
ফিচার : ঈদ সংখ্যা
২১ অক্টোবর, ২০০৬.

পঞ্চাশ পয়সার রাত!

যুগে যুগে বিভিন্ন প্রযুক্তি এসেছে, আসছে, আগামীতেও আসবে। আলফ্রেড নোবেল যেমন চিন্তা করেননি ডিনামাইট মানুষ হত্যার কাজে ব্যবহার করা হবে, তেমনি মোবাইলের আবিষ্কারকরাও ভাবেননি এ যন্ত্র বাংলাদেশের মানুষের হাতে পড়লে ভালোর সঙ্গে খারাপ কী কী ঘটতে পারে।

ভোর পাঁচটা। সেহরি করে মাত্র বাসার সবাই পিঠ লাগিয়েছি বিছানায়, চোখ বুজেছি। মোবাইলের বিকট শব্দ। তড়াক করে উঠে বসলাম। বিদ্যুৎবিহীন ভোরে আতঙ্কিত হলাম। কে জানে কোনো দুঃসংবাদ কি না! নাহ্, নম্বরটা চেনা না। ধরলাম, জিজ্ঞেস করলাম কে বলছেন? উত্তর এলো না, শুনলাম ভিন্ন কটু কথা। লাইন কাটলাম। আবার, আবার। সারাদিন অফিসে বাসায় শুধু মোবাইলে কল। দুই দিনে পঞ্চাশবার কল, গুনলাম। ত্যক্ত আমি মোবাইল সাইলেন্ট করলাম। প্রিয় বন্ধুর বাবার মৃত্যু সংবাদ মিস করলাম মোবাইল সাইলেন্ট রাখাতে। আমি তুচ্ছ সিভিলিয়ান, আর্মি দিয়ে যদি কিছু হয়! এ আশায় কর্নেল ভাইকে দিয়ে সেই নম্বরে ফোন করিয়ে অনুরোধ করলাম আমাকে যেন বিরক্ত না করে। পরক্ষণেই আবার ফোন। আমাকে কর্নেল দেখাস? তোর মোবাইল নম্বর সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেব। সিম চেঞ্জ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। মনে মনে হাসলাম, তিক্ত হাসি আর বললাম ব্যাটা তুই তো জানিস না আমাকে চ্যালেঞ্জ করার ফলাফল কি হতে পারে। গ্রামীণফোনের নম্বর থেকে ফোনটা আসাতে আমি গ্রামীণের কাস্টমার সাপোর্টে ই-মেইল করলাম ঘটনার বিবরণ দিয়ে। দশ মিনিটের মধ্যে ফোন গ্রামীণের কাস্টমার কেয়ার থেকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই যন্ত্রণা বন্ধ। রোজা উপলক্ষে মধ্যরাতে কল রেট পঞ্চাশ পয়সা করাতে অসুস্থ মানসিকতার লোকজন যথেচ্ছ অপব্যবহার করছে এ সুযোগের।

ঈদের মার্কেট। ক্বচিৎ যাই। এবার যেতে বাধ্য হয়েছি নানাবিধ কারণে। শপিং মলগুলোর প্রত্যেক ফ্লোরের রেলিংয়ে বিভিন্ন বয়সী ছেলে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। কী দেখছে? নারী আগমন, বিবিধ বয়সী। যাক, দেখুক। নিদেনপক্ষে গাউছিয়া, নিউমার্কেট, চাঁদনী চকের মতো ধাক্কাধাক্কি তো করছে না। এরা আরো স্মার্ট। মোবাইলে ক্যামেরা। যার যাকে পছন্দ হচ্ছে ছবি তুলে নিচ্ছে। কি আনন্দ। এসব ছবি দিয়ে অনায়াসে কাটপিস বানানো যাবে। তারপর নেটে ছেড়ে দেবে। আমরাই বলব– হু, মেয়েটা কত খারাপ। যে ছবি ছেড়েছে সে সম্পর্ক গড়ার সময় ধার্মিক নামাজি পর্দানশিন মেয়ে খুঁজবে। চাবকে এসব ছেলের পিঠের ছাল তুলে দেওয়া যেত!

রবিন হলে থাকে ঢাকা ভার্সিটির। পড়ালেখায় সিরিয়াস। পরীক্ষা চলছে থার্ড ইয়ার ফাইনাল। মাঝরাতে ফোন, অচেনা নম্বর। ধরবে না ধরবে না করেও ধরল। আমি

সোমা, অমুক সাবজেক্ট, ফোন রাখবেন না। যা বলি তা যদি না করেন আপনার বাসায়, রিংকির বাসায় (বাসার ফোন নম্বর বলে সোমা নামের মেয়েটা) জানিয়ে দেব রিংকির সঙ্গে রিলেশনের কথা। 'কী করতে হবে?' আগামী দিন মল চত্বরে আসবেন বেলা ৩টায়। আমি আপনাকে খুঁজে নেব, সঙ্গে আপাতত দশ হাজার টাকা আনবেন। রবিন শ্বাস চেপে পড়া মাথায় তুলে পুরো ব্যাপারটা ভাবে। কেউ জানে না রিংকির কথা, ডিপার্টমেন্টেও ওরা এমনভাবে চলে যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে। রিংকির মা জানলে কালই অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবে। ব্যাংক থেকে টাকা তোলার সময় কি কেউ দেখে ফেলল? রবিনের কাছে ঠিক দশ হাজার টাকাই আছে, কেউ কোথাও নেই এত রোদে। রবিন ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই দু'পাশ থেকে দুজন ছেলে ওর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে থাকে– টাকা দে। আনিনি। পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল নেওয়া সারা। হাতঘড়িটাও ভোজবাজির মতো পাশের ছেলের হাতে। চড় চাপড় ঘুষি হজম করে রবিন টলতে টলতে হলে ফেরে। এমন ঘটনা খুঁজলে কমপক্ষে শ'খানেক পরিচিত মানুষদের ঝুলি থেকেই সংগ্রহ করা যাবে।

টিপস : * মোবাইলে কেউ বিরক্ত করলে আপনি যে কোম্পানির সাবস্ক্রাইবার তাদের শরণাপণ্ন হোন। অনেকে নম্বর ডিসপ্লে করার অপশন অফ করে ফোন করে। তাহলে আপনার কাছে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত ফোনের নম্বরটি আপনি জানতে পারবেন না। আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার আপনার কল লগ চেক করে নম্বরটি জানাতে পারবে।

* নম্বরটি জানতে পারলে সেই মোবাইল কোম্পানিকে আপনার লিখিত অভিযোগ জানান। সাময়িকভাবে তিনদিনের জন্য তারা সিম লক করে দেওয়ার এখতিয়ার রাখে।

* তারপরও সমস্যার সমাধান না হলে জিডি করুন। কপি মোবাইল কোম্পানিকে দিন। তারা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ হাতে পাবে।

মনে রাখবেন কারো অসভ্য আচরণের জন্য যদি আপনি সিম চেঞ্জ করেন তাহলে সেই অসভ্য আরেকজনকে একইভাবে উত্ত্যক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত হবে। মোবাইলে ছবি তোলার ব্যাপারে আপাতত লাগসই কোনো সমাধান দিতে পারছি না। তবে এ পদ্ধতিটি আমার বান্ধবীর। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকলে প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। সোজা হেঁটে গিয়ে মোবাইল কেড়ে নিয়ে সজোরে আছাড় দিন অথবা সঙ্গে যদি লোকবল যথেষ্ট থাকে তাহলে মোবাইলের মেমোরি কার্ড খুলে নিন। ফোন মেমোরিতেও ছবি সেভ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ছবি ডিলিট করাই সহজ সমাধান। অপরিচিত নম্বরের ফোন রিসিভ করলেও অযৌক্তিক কোনো আবদার শোনা থেকে বিরত থাকুন, নেহায়েত কৌতূহলও মেটানোর প্রয়োজন নেই। মোবাইলে বন্ধু না খোঁজাই উচিত। পত্রিকায় ফোন নম্বর দিয়ে নিজেকে ফলাও করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশের মানুষের এখনো 'প্রাইভেসি' শব্দটির প্রতি তেমন কোনো শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠেনি। সেহরির

সময়কার পঞ্চাশ পয়সার মিনিট যেন আপনার ক্ষেত্রে ঘটলে আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন সে জন্যই এ লেখা। প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করার অধিকার আমার-আপনার সবার। সেই অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া মানে মানবাধিকারের ওপর হাত। আমি তা হতে দিইনি, দেবও না। আপনি কি দেবেন?

➢ সমকাল
নারীস্থান
২২ অক্টোবর, ২০০৬.

আমি যে বহ্নিশিখা...

দেশে বর্তমানে বেশ অস্থিরতা বিরাজ করছে। সচেতন মানুষ মাত্রই যারপরনাই উদ্বিগ্ন। যে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক-উদ্বেগ কাজ করে। তবে এ উদ্বেগের পরিমাণ নারীর জন্য একটু বেশি। ধরুন যাতায়াতের কথা। কার্যোপলক্ষে বাসার বাইরে গেলে স্বাভাবিক সময়েই বাসে উঠতে কিংবা ট্যাক্সিতে চড়তে বেশ বেগ পেতে হয়। আর এখন তো কথাই নেই। গত মাসের ২৯ তারিখের ঘটনা সবাই দেখেছেন, জানেন টিভি এবং পত্রিকার মাধ্যমে। এদিন মিসেস আজিমের যে অভিজ্ঞতা সেটাই আপনাদের জানাচ্ছি তার জবানিতে– 'সেদিন অফিসগুলোতে নির্দেশ আসে ঠিক ১২টার মধ্যে সবাই যেন চলে যায়। মতিঝিল অফিসপাড়ায় মোটামুটি আতঙ্ক। অফিস থেকে তো বের হলাম এখন যাব কিসে? বাস নেই। এত দূরত্বে রিকশায় ওঠার কোনো মানে হয় না। বহু প্রতীক্ষার পর এক সিএনজি চালক রাজি হলেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আসার জন্য। দ্বিগুণ ভাড়ায়। তিনশ' টাকা। যা হোক উঠে গেলাম। কারণ শহরে তখন থমথমে অবস্থা। সঙ্গে ১৬ হাজারের মতো টাকা, ৫ লাখ টাকা সমমূল্যের সঞ্চয়পত্র। নিরাপত্তার খাতিরে খাবারের ব্যাগে টাকা, সঞ্চয়পত্র নিলাম। মাঝপথে আসার পর সিএনজি চালক আর আসবেন না। খাবারের ব্যাগ সিএনজিতে রেখে নেমে এলাম ভুলে। আমার আটাশ বছরের চাকরি জীবনে এই প্রথম এমন সর্বনাশ। রিটায়ারমেন্টের আর তিনদিন বাকি। এমন অস্থির অবস্থা না থাকলে আমার এই সমূহ ক্ষতি হতো না। আসলে আমাদের কথা কি কেউ ভাবে? চাকরির মেয়াদ আমার না হয় শেষ। বাসায় বুকে ধুকপুক নিয়ে বসে থাকি ছেলেমেয়েরা অফিস থেকে ঠিকমতো বাসায় না ফেরা পর্যন্ত।'

যে কোনো অরাজক অবস্থায় নারী ও শিশুরা হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু মানুষের লোভ ও অবিবেচক ভূমিকার জন্য যে করুণ দশা তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে দেশের হাজার হাজার স্কুলের শিক্ষার্থী। নভেম্বর মাস। শিডিউল অনুযায়ী স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু স্কুল চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। এত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে স্কুলগুলো অভিভাবকদের বাচ্চা স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছেন। যেমন ৯ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ঘেরাও থাকাতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হঠাৎই ক্লাস শেষ করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। প্লে গ্রুপের জিসান বসে থাকে একা স্কুল কম্পাউন্ডে। ওর বাবা-মা দু'জনই অফিসে। ফোন করা হয়েছে, কিন্তু তারাও জিসানকে নিতে আসার জন্য কোনো যানবাহন পাচ্ছেন না। একজন মানুষের জন্য আমরা এত সাফার করছি। 'বলুন কি হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করলে?' জিসানের মা হন্তদন্ত হয়ে এসে ক্ষোভের সঙ্গে এ বাক্য উচ্চারণ করেন।

পত্রিকায় খবর এসেছে বাবা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় মেয়েকে গণধর্ষণ করেছে বিএনপির ক্যাডাররা। আপনি-আমি কেউ কি কোনোদিন পড়েছি

বা শুনেছি বাবা অন্যদল করায় বিরোধী পক্ষের কোনো নেতা অন্য পক্ষের নেতার ছেলেকে রেপ করেছে? শুনিনি। শুনবও না। লাঞ্ছনা মেয়েদেরই দিতে হবে। মেয়েটার নিজের তো বটেই পরিবারের আর সবারও মনোবল চুরমার হয়ে যাবে। সে আদিমকাল থেকে এ সংস্কৃতি চলে আসছে। আমরা না কি সভ্য হয়েছি! এর কোনো বিচারও হবে না। আপনিও জানেন আমিও জানি। রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার নারীদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম সহানুভূতিও এখন আর কাজ করে না। আমি নিজের কানে প্রতিদিন শুনি– 'মিছিলে মেয়েদের পিটাইছে? খুব ভালো করছে। মেয়েরা যায় কেন মিছিলে?' বিশ্বাস করুন খুব ভদ্র শিক্ষিত (!) নারী-পুরুষের মুখ থেকে আমি এ মন্তব্য শুনি। নারীরা দেশ শাসন করছে সেখানে বলে না– কেন গিয়েছে শাসনকার্যে! অথচ মিছিলে গেলে এ মন্তব্য। মতিয়া চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, আইভি রহমান, জাহানারা ইমাম প্রমুখ ব্যক্তিত্ব মিছিলে না গেলে আপনার-আমার বাংলাদেশও হতো না, নারী প্রধানমন্ত্রীও হতে পারতেন না। এ দেশের বঞ্চিত-অবহেলিত নারীরা সামনে না এলে শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তিও ঘটত না।

পাঁচ বছরে দেশে পৌনে পাঁচ হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এটা হিসাবে এসেছে। এর বাইরে কি হয়েছে আপনি-আমি কেউই জানি না। সংখ্যালঘু ধর্ষণ তো জায়েজ, হালাল এমনই ভাব সর্বত্র। পূর্ণিমার কথা আমি ভুলিনি। আপনি কি ভুলেছেন? হিজাবের সংখ্যা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। বিচারের হার কি বেড়েছে অন্তত গুণিতক হারে? না। বখাটেদের দৌরাত্ম্যে বহু পরিবারের আদরের মেয়েটি চলে গেছে নীরবে-নিভৃতে। একটিরও বিচার হয়নি। শুধু গাইবান্ধার তৃষার মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিম্ন আদালতে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল এটুকু আমার মনে আছে। কোনো রাজনৈতিক দলের একজনের মুখেও শুনিনি নারীর নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন। পাঁচ বছরেও সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি আনার বিলটি পাস হয়নি। ভিজুয়াল মিডিয়ায় নাকি কান্নার সুরে পর্দা করার জন্য প্রচুর অনুষ্ঠান পাঁচ বছরে হয়েছে, বখাটেদের শাস্তি চেয়ে কোনো আবেদন শুনিনি। ঘরে ঢুকানোর জন্য নারীকে বহু মন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেউ বলতে পারেনি আপনারা দেশের কাজে আসুন, আপনাদের নিরাপত্তা আমরা দেব। দেয়ালে দেয়ালে চিকা দেখেছি 'মহিলাদের অমুক করা হারাম, তমুক করা হারাম'। একটা চিকা দেখিনি নারীদের ওপর নির্যাতন করা হারাম, যৌতুক চাওয়া হারাম, নারীদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো হারাম। সংবিধানে নারী-পুরুষের স্বার্থ-সংরক্ষণে যেসব জায়গায় 'সম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সতর্কতার সঙ্গে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তো আমাদের গত পাঁচ বছরের অর্জন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে তিনজন নারীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ইতিবাচক। ঠিক আছে। যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন নারী। আজও 'সিডও' সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এ ক্ষমতাসীন নারীরা ঘটাতে পারেননি। যেখানেই নারীর অধিকার বাস্তবায়নের কথা এসেছে সেখানেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে শরিয়া আইন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে মুসলিম পারিবারিক আইন, কেন? মুসলিম ল' মানলে সব ক্ষেত্রেই তা মানা হোক।

শুধু নারীর জন্য কেন? চোরের হাত কেটে দেওয়া হোক। শরিয়া আইন তো তাই বলে। ফতোয়া দেওয়া বেআইনি রায় হওয়ার পরও সরকার তা রদ করতে পারেনি কার্যক্ষেত্রে, তথাকথিত ইসলামবাদীরা ক্ষিপ্ত হবে এ আশঙ্কায়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে নারীর অংশীদারিত্ব সরকারের প্রধান পদে থাকলেও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, নীতি, পরিকল্পনা ও সর্বোপরি অবহেলার কারণে কোনো অর্জনই শতভাগ আনন্দ বা সাফল্য আনতে পারছে না। গুটিকয়েক মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র পরিসরে এ অর্জন সাধিত হচ্ছে। সামগ্রিক বা ব্যাপক একটা পরিবর্তন আমাদের নারী সমাজ নারী শাসকদের কাছ থেকে যা আশা করেছিল তা অর্জিত হয়নি।

সামনে আবার অনেক সংকট। সব দোলাচল পেরিয়ে হয়তো নির্বাচন হবে। আমাদের আশা একটাই, এবারের পটপরিবর্তনকালে যেন কোনো পূর্ণিমার চোখের জল আমরা না দেখি, যেন কোনো মাকে বলতে না হয় 'বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, এতজন একসঙ্গে নিতে পারবে না, তোমরা একজন একজন করে আস।' কোনো বেজন্মা কুলাঙ্গারকে যেন কোনো মায়ের নিজের মেয়েকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য 'বাবারা' সম্বোধন করতে না হয়। মিছিলে যাওয়ার অপরাধে কোনো নারীকে যেন পুলিশের হাতে বিবস্ত্র হতে না হয়। বাচ্চাকে স্কুল থেকে নিয়ে ফেরার পথে কোনো গৃহবধূকে যেন পুলিশের নির্যাতনে হাত ভেঙে হাসপাতালে পড়ে থাকতে না হয়। নারী বহ্নিশিখা হবে শুধু নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলে, তার প্রমাণ আমার দেখছি উপদেষ্টা পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ নারীর উপস্থিতিতে এবং সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

➢ সমকাল
নারীস্থান
১২ নভেম্বর, ২০০৬.

‘মা’কে আমার পড়ে যে মনে...

স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা রুমির মা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক এবং সম্প্রদান কারকে তার অবদান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে। শ্রদ্ধেয় জাহানারা ইমাম হারিয়েছেন ছেলে, স্বামী দুই-ই আমাদের মুক্তভূমি উপহার দিতে গিয়ে। মুক্তির স্বাদ ম্লান হয়ে যায় পঁচাত্তর-পরবর্তী ক্ষমতাসীনদের রাজাকার তোষণনীতির কারণে। দেশের সেই সন্ধিক্ষণে এ ত্যাগী মা ‘নির্মূল কমিটি’ গঠন করেন, একাত্তরের খুনি এবং পাকিস্তানি দোসর রাজাকারদের সমূলে উৎপাটনের অঙ্গীকার নিয়ে। একজন যোদ্ধার মা যেভাবে সারাদেশের মানুষের কাছে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হয়ে ওঠেন, এখানে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

১৯৭৮ : ১১ জুলাই। জেনারেল জিয়ার সংবিধান সংশোধনের সুযোগে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের অনুপ্রবেশ। গোলাম আযমের হাতে পাকিস্তানি পাসপোর্ট, দেশে আসার অনুমতি লাভ অসুস্থ মাকে দেখার অজুহাতে- কথায় আছে সুঁই হয়ে ঢোকা, ফাল হয়ে বের হওয়া। মওকা কাজে লেগে যায় গোলাম আযমের। সরকারের আশীর্বাদে বাংলাদেশেই স্থিতি হয় তার। নিষিদ্ধ ঘোষিত মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত ও সক্রিয় হয়।

১৯৯১ : ২৯ ডিসেম্বর। গোলাম আযম (তখনো পাকিস্তানি নাগরিক) জামায়াতের আমির নির্বাচিত। সারাদেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোলাম আযম অফিসিয়ালি রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়ায়। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার সংবিধানের এমন চরম লংঘন (বিদেশী নাগরিকের দেশের রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়া) একেবারে না দেখার ভান করে এড়িয়ে যায়।

১৯৯২ : ২ ফেব্রুয়ারি। জাহানার ইমাম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে গড়ে তোলেন ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’। শপথ একটাই, একাত্তরের অপরাধীদের বিচার ও তাদের বর্তমান কর্মকান্ড - রুখে দেওয়া। এ কমিটিতে স্বাক্ষর করেন **১০১** জন। তারা জামায়াতের কর্মকান্ডকে অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন। নতুনভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ শুরু করার দাবি উত্থাপন করেন। এ কমিটি পরে জানায়, জনতার আদালতে এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারের রায় ঘোষণা করা হবে ২৬ মার্চে, যা ২১তম স্বাধীনতা দিবস।

১৯৯২ : ২৪ মার্চ। গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে তৎকালীন সরকার জেলে পাঠায়। কিন্তু তাকে দেওয়া হয় ভিআইপি ট্রিটমেন্ট। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শহীদ জননী জাহানার ইমাম এবং তার অন্য সহযাত্রীদের এ ধরনের আন্দোলন চালানোর পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। প্রশাসন থেকে এ-ও বলা হয়, জনতার আদালত, সেখানে গোলাম আযমসহ অন্য মুখ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

চালানো আসলে দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান পরিপন্থী। এ ধরনের কর্মকান্ড আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মতো অপরাধ এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। দেশে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টির হোতা হিসেবে এসব বিদ্রোহীর কোর্টে বিচার হতে পারে। খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমির মা জাহানারা ইমাম ও তার আরো ২৪ জন সহযাত্রীর বিরুদ্ধে ‘ রাষ্ট্রদ্রোহিতার ’ মামলা করে। জাহানার ইমাম ও তার সতীর্থরা প্রত্যেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়ে জামিন নেন।

১৯৯২ : ২৬ মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো মানুষের সামনে জাহানারা ইমাম জনতার আদালতের সব বিচারকের পক্ষে রায় পড়ে শোনান।

১৯৯৩ : ৪ এপ্রিল। জাহানারা ইমাম ক্যান্সারের চিকিৎসার্থে আমেরিকা যান।

১৯৯৪ : ৭ জুলাই। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা মাথায় নিয়ে শহীদ জননী তার শহীদ ছেলে রুমির কাছে চলে যান আমাদের ছেড়ে। রেখে যান এ অভাগা জাতির প্রতি তার শেষ চিঠি–

‘আমার সতীর্থ যোদ্ধারা, আপনারা গোলাম আযম ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছেন, সে সঙ্গে গত তিন বছর লড়াই করছেন মুক্ত বাংলাদেশে চলমান স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেও। বাঙালি জাতি হিসেবে, আপনাদের একতা ও সাহস অতুলনীয়। আমাদের লড়াইয়ের শুরু থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধরত থাকা ছিল আমাদের ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস। ক্যান্সার আমাকে আমার চূড়ান্ত সময়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি লড়াই বন্ধ করিনি। কিন্তু ক্যান্সার আমার সশরীরে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। অমোঘ নিয়তি মৃত্যুর দিকে যাত্রা বন্ধ করার কোনো উপায় আমার নেই। সেজন্যই আমি আবার আমাদের প্রতিজ্ঞা– লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করার কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনারা অবশ্যই আপনাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন। আপনারা একতাবদ্ধ থাকবেন এবং এর শেষ না দেখে লড়াই থামাবেন না। আমি আপনাদের মাঝে থাকব না, কিন্তু আমি জানব আমার লাখো বাঙালি সন্তান আগামীতে মুক্ত সোনার বাংলায় তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাস করছে। আমাদের সামনে এখনো লম্বা এবং বন্ধুর পথ। সমাজের সর্বস্তর থেকে মানুষ এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা, নারী, ছাত্রছাত্রী, তরুণ সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে এ লড়াই চালিয়ে নেওয়ার জন্য। আমি জানি, জনগণের চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শক্তি আর কিছু হতে পারে না। জনগণই শক্তি। আমি এ বিশ্বাসে বাংলাদেশের মানুষের হাতে গোলাম আযম ও তার দোসর অন্যান্য রাজাকার আলবদর, যুদ্ধাপরাধীর বিচারের ভার ছাড়লাম। মুক্তিযুদ্ধের সেই অনবদ্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে সামনে এগোনোর কথা বললাম। নিশ্চিত, জয় আমাদের।’ –জাহানারা ইমাম

পাদটীকা : আমি জানি না আমার এই সাহসী 'মা' আজ কি ভাবছেন দূর আকাশে বসে! হাসি পায় যখন নিজামী-মুজাহিদীরা সংবিধান রক্ষার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে। আমি শুধু জানি আমরা 'মা'কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি একটুও রক্ষা করতে পারিনি। পারিনি তার সেই বিশ্বাসের এতটুকু মর্যাদা রাখতে। তাই আমাদের ১৬ ডিসেম্বরগুলো শুধু আলোকসজ্জারই দিন অথচ মনে এখনো গহিন অন্ধকার...।

- ইন্টারনেট থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত

➢ সমকাল
নারীস্থান
১৭ ডিসেম্বর, ২০০৬.

রাজনীতিতে নারী ও আমাদের আগামী

দেশ যখন ব্রিটিশ শাসনের ভারে ভারাক্রান্ত, সেই ১৯৩০-৪০ সালের দিকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এ দেশের নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সে উজ্জ্বল সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রবল বিক্রমে– বিপ্লবী শহীদ প্রীতিলতা। একই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও নারীরা তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসার মূল্য কারো চেয়ে এক কড়াও কম দেননি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের সংবিধান এবং আইন দুটিই জনগণের চলমান জীবনে নারীর সমান অধিকার-অংশীদারিত্ব সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর হাত ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া রাজনীতে সক্রিয় হন, দেশ গঠনে নারীর সমান অংশগ্রহণ, ব্যাপারটা তেমনই দাঁড়ায় সাদা দৃষ্টিতে দেখতে গেলে। যদিও দু'জনই এ দেশের রাজনীতিতে ব্যতিক্রম। কারণ তাদের রয়েছে পারিবারিক সূত্র। তবে শেখ হাসিনা ছাত্র অবস্থাতেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ষাটের দশকে আর খালেদা জিয়া রাজনীতিতে আসেন স্বামী জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর।

১৯৭০-৮০ এ সময় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা হাতে গোনা এবং তাদের অংশগ্রহণ অনৈসলামিক হিসেবে চিহ্নিত করে রক্ষণশীল সমাজ এ অংশগ্রহণকে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করে। ধর্মনিরপেক্ষতার যে মূলমন্ত্র সংবিধানে সন্নিবেশিত, নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করলেও নারীর অন্যের ওপর নির্ভরশীল জীবনাচরণ তাতে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৯ সালে যে নির্বাচন হয় তাতে ২১২৫ জন নির্বাচনকারীর মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ১৭ জন এবং একজন নারীও এ নির্বাচনে জয়ের মুখ দেখতে পারেননি। মাত্র ৩ জন নারী তার এলাকায় ১৫ শতাংশ ভোট পান। ১৯৭৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মাত্র একজন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে ৪ জন নারী চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। নেতারা, যারা দেশ পরিচালনা করছিলেন তৎকালীন সময়ে, তারা নারীদের এ পশ্চাৎপদতার খতিয়ান দেখে সংসদে নারীদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেন। সংরক্ষিত আসনের ভাবধারাই পুরো সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরে, যেমন প্রশাসনে তেমনি দেশের নীতিনির্ধারণে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের সংসদে যে নারীরা আসেন তাদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন গৃহবধূ এবং বাকি ২৭ জনের আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনো ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

১৯৮৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনের পর সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। জাতীয় জীবনে নারীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আসলে কারোরই তেমন কোনো সদিচ্ছা দেখা যায়নি। ১৯৮৮-এর মাঝামাঝি সময়ে ৩ জন করে

নারী ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদে দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলেও নারীকে সম্পৃক্ত করা হয় কিন্তু এ আইনে বলা হয়, মোট সদস্যদের ১০ শতাংশের বেশি নারী হতে পারবে না।

বিগত দুই দশকে নারীরা রাজনীতির অঙ্গনে মোটামুটি একটি স্থিতিশীল অবস্থানে পৌঁছান। কোটা সিস্টেমে স্থানীয় সরকার এবং সংসদে নারীর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে আমরা যে বিষয় দেখি তা হচ্ছে স্বাধীনতাপূর্ব যারা রাজনীতিতে এসেছেন তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মূলত রাজনীতিতে আসেন। বাকিরা এবং বর্তমানে যারা এসেছেন বা আসছেন তারা ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে প্রবেশ করেছেন এবং করছেন রাজনৈতিক অঙ্গনে। রাজনীতিতে নারীর অংশীদারিত্বের গতি খুবই মন্থর। যারা আছেন তারা অনেক বাধা-বিপত্তি সয়ে এতদূর এসেছেন। টাকা অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে এ সেক্টরে কাজ করাতে নারীরা অধিকমাত্রায় পিছিয়ে পড়ছেন বলে অনেকের বিশ্বাস। কারণ এমনিতেই উপার্জনের উৎস এমন সব পেশায় নারীর প্রবেশাধিকার খুবই কম। টাকার খেলা বন্ধ না হলে নারীর পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত হওয়া এক কথায় দুষ্কর।

২০০১ সালের নির্বাচনে ৩০০ সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারী সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসেন। এর অন্যতম কারণ অঢেল টাকার অভাব। জেন্ডারভিত্তিক কোনো রেকর্ড কোনো দলই না রাখায় কোন দলে কতজন নারী আছেন বা থাকা দরকার এটা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। নারী ভোটারদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে যে কোনো দলের নারী কর্মীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। অথচ সব দলেই সীমিত পরিমাণে নারীরা দলের প্রেসিডিয়াম বা অন্য কোনো বোর্ডে সংশ্লিষ্ট। দুই প্রধান দলের সঞ্চালক নারী। কিন্তু তাদের পরামর্শদাতা থেকে শুরু করে একান্ত সচিব, রাজনৈতিক সচিব সবাই-ই পুরুষ। এ কথা ঠিক, দুই প্রধান নেত্রী মুসলিম অধ্যুষিত দেশে প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং দলীয় প্রধানের পদ অলংকৃত করে নারীকে শাসক হিসেবে না মানার যে আচার দেশে প্রচলিত তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আসল লক্ষ্য গণতন্ত্র তা যেমন দলের ভেতর চর্চিত নয়, তেমনিভাবে দলে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোতেও তাদের জোরালো উদ্যোগ নেই এবং অগ্রজ দু'একজন নারী ছাড়া কেউ কোনো দলে সামনের সারিতে নীতিনির্ধারক বা পরামর্শ দাতার কাতারে দুই নেত্রীর পাশে আবির্ভূত হননি, যাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নির্বাচন পদ্ধতিতে নারীরা কোনো মুখ্য দায়িত্ব পান না, তাদের সে ক্ষমতাও দেওয়া হয় না। নির্বাচনী ক্যাম্পেইন, সভা সমিতির ব্যবস্থা, মিছিলের অগ্রে থেকে মানববর্ম হিসেবে পুলিশের সামনে উপস্থিত থাকা, বিভিন্ন ইস্যুতে র‍্যালি বের করা– এগুলোই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দলের নারীদের কাজ। এছাড়া নারীদের জন্য নির্বাচনের

সময় করা স্পেশাল বুথগুলোতেও তারা ডিউটি দিয়ে থাকেন। পোলিং এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে নারী ভোটারের সংখ্যা প্রতি নির্বাচনের আগেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১, ১৯৯৬-এর সংসদ নির্বাচন এবং ১৯৯৩ ও ১৯৯৭-এ স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নারী ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি নারীদের রাজনীতি সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে। সেই তুলনায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অপ্রতুল সংখ্যা আমাদের হতাশও করে।

১৯৭৩ সালে স্থানীয় সরকারে প্রথম নারীর অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ১৯৯৭-এর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন রাজনীতিতে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন। এ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করেন। ১৯৯৭-এ একটি আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এ আইনে বলা হয়, সংরক্ষিত আসন ছাড়া অন্য আসনেও নারীরা চাইলে সরাসরি নির্বাচন করতে পারবেন। আগে যেখানে দলীয় নমিনেশন বা পরোক্ষভাবে নারীরা নির্বাচিত হতেন সেখানে এই উন্মুক্ত পদ্ধতি ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং ১২৮২৮ জন নির্বাচিত নারী স্থানীয় সরকারে সম্পৃক্ত হন। একাধারে ২০ জন এবং ১১০ জন নারী চেয়ারম্যান (চেয়ারপার্সন) ও সদস্য নির্বাচিত হন। অধিকাংশ নারী প্রতিনিধিই পরিষদের মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। এটা নির্বাচিত সদস্যদের অভিযোগ। তারা মূলত পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, কুটিরশিল্প, ত্রাণ কার্যক্রম, সালিস এসবেই অংশগ্রহণ করেন।

১৬ বছর নারী প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের প্রধানও নারী। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এসব ক্ষেত্রে সেই 'প্রধান' প্রতিনিধিত্ব তেমন কোনো উজ্জ্বল আলো ফেলেনি। সরকারের কোনো অংশেই নারীর সংখ্যা শতকরা হিসেবে ৩-এর বেশি কখনো যায়নি।

১৯৯৬-এর আগে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় কোনো নারী মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া অন্য কোনো ভারি কেবিনেট কেউ পাননি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় – এগুলোই বরাবর ভাগ্যে জুটেছে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যদের। একমাত্র মতিয়া চৌধুরী কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। সাজেদা চৌধুরী পান বন ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় । বিএনপির শাসনামলে খুরশিদ জাহান হক ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী (সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন)। এর আগে জাতীয় পার্টি থেকে ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া মন্ত্রীত্বের দায়িত্বে ছিলেন।

তবে সামগ্রিক বিবেচনায় নারীর অংশীদারিত্বের পরিসংখ্যান রাজনৈতিক অঙ্গনে আশাব্যঞ্জক কোনো বার্তা আমাদের শোনায় না। সংখ্যা বিবেচনা করলে অতি কম,

খুব কম। কিন্তু আমাদের নারী সমাজের ভূমিকা ছাড়া যেমন বাংলাদেশ হতো না তেমনি এদেশে আসত না গণতন্ত্র। তাই নারী বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পরিকল্পনা-পদক্ষেপ বিবেচনা করে নারী ভোটাররা তাদের মূল্যবান ভোটটি দেবেন সেটাই আমাদের আশা। আপনার একটি ভোট, আমার একটি ভোট এভাবেই অনেক এবং সেভাবেই নির্ধারিত হবে আমাদের আগামী।

*ইন্টারনেট থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত

➢ সমকাল
নারীস্থান
৭ জানুয়ারি, ২০০৭.

এসো হাতে হাত ধরি, উল্লাস করি...

নতুন যে কোনো সম্পর্ককে আমি ইদানীং আর আগের মতো আগ্রহে স্বাগত জানাতে পারি না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক কদর্যতা, বীভৎসতা– আগে জানা সব ধারণাকে চুরমার করে দিচ্ছে। চেনা জগৎটা প্রতিনিয়ত কেমন অদ্ভুত এক আঁধারের ঘের হয়ে ধরা দিচ্ছে মানসপটে। যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত টিকে যাওয়া স্কুলের বন্ধুরাই আমার জন্য ভালো। অনেক দিনের গ্যাপে দেখা হওয়ায় সেভাবে হয়তো একে অন্যের ভাবনার জগৎকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ছুঁয়ে দিতে পারি না ঠিকই কিন্তু অকারণে ক্ষতি করা, বদনাম করা এসব থেকে তো দূরে থাকা যায়!

সময়ের হাত ধরে...
মাবরুকার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এ বছর সতেরোতে পা রাখল। বাবা-মা ভাইদের পরে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সম্পর্কে যার সঙ্গে আমি পথ হাঁটছি প্রতিদিন। আমার অসহ্য মন খারাপ। খেপাখেপি ঘুরতে হবে রিকশায়, উল্টাপাল্টা কিছু কাজ না করলেই নয়, মেজাজ ঠান্ডা হবে না। সব কাজ বাদ দিয়ে, কোনো অজুহাত না দেখিয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন না করে, কে আমার পাশে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াবে? 'মাবরুকা'। আমার ভাইয়ের বিয়ে অথচ আমার অনার্স থার্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা। কে আমার বদলে সব কাজ করবে, বিয়ে সামাল দেবে? 'মাবরুকা'। ভাইয়ার হলুদ হচ্ছে, আমি মাবরুকার বাসায় পড়ছি, পরের দিন পরীক্ষা দিচ্ছি নিশ্চিন্তে। ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি দল বেঁধে। আমি কোনো কিছুই দেখে রাখি না, গুছিয়ে আনি না। আমি যাই প্রকৃতি দেখতে, তাই করি। আমার চুলের ব্যান্ডটা পর্যন্ত দেখে কে ব্যাগে পুরবে? 'মাবরুকা'। ঝুট ঝামেলার দশরথ পেরিয়ে বিয়ে হলো আমার। দিন-রাত ডিউটি দিয়েছে বাসায়, বিয়ে বাড়িতে তথাকথিত আত্মীয়রা নয়, বন্ধুরা- মাবরুকার তদারকিতে। এমন ভালোবাসার বিনিময় কী হতে পারে? শুধুই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তাই দিয়ে যাই এর বেশি কিছু নয়।

এসো নবীন, হাতখানি বাড়িয়ে বলছে প্রবীণ..
লেখালেখি করছি বেশ কয়েক বছর। বইও বেরিয়েছে; কিন্তু মনের মতো হয়নি কোনোটাই। এবারের মেলা টার্গেট করে তাই ভেবেছি ভালো একটা প্রকাশনী থেকে বই বের করতে হবে। লেখকের নাম বললাম না। যারা বলে যে, বিখ্যাত লেখকরা নবীনদের জায়গা করে দিতে ইচ্ছুক নয়, সাহায্য করেন না, এমনকি লেখা পড়ার আগেই বলেন কিছু হয়নি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এ ঘটনা– কবিতার বইয়ের পান্ডুলিপি দেখে দেওয়া থেকে শুরু করে, বইয়ের নাম, ফ্ল্যাপ, প্রচ্ছদ, প্রকাশক ঠিক করা সব এ বিখ্যাত নারী কথাসাহিত্যিক আমার হয়ে দু'হাতে করেছেন। আমি এমনই এক পেশায় জড়িত যেখানে অফিসের পরে আমার পক্ষে কোনো কিছুতেই সময় দেওয়া দুষ্কর। বিখ্যাত লেখকরা চাচ্ছেন নবীনরা আসুক

সামনে, নবীনদের দায়িত্ব অন্তত আগামীতে ভালো লিখবে এমন স্বাক্ষর বর্ষীয়ানদের সামনে তুলে ধরা। এখানে কর্মের পথ ধরে বন্ধুত্ব, নিঃস্বার্থ দান, সাহিত্যিক পরিচয়ের সম্প্রীতি গড়ে দিয়েছে অযুত ফারাকেও এক আশ্চর্য ভালোবাসার মেলবন্ধন।

ঋণ আছে....

সকালে উঠেই ভাবি 'তাকে' ফোন করব। কাজের চাপে যখন নাভিশ্বাস তখন আলগোছে কপাল চেপে তার কথা ভাবি। সব সম্পর্কেই কি পরিণতি হয়? বুকের আলমিরাতে মানুষ একজনমে কত বিবিধ বিচিত্র সম্পর্ককে বয়ে চলে সরবে-নীরবে। আমি 'তাকে' বুকে নিয়ে প্রতি মুহূর্ত যাপন করি 'তাকে' পাব না জেনেও। অসম্ভব সব কষ্টে- আনন্দে-প্রাপ্তিতে-অবহেলায় 'তাকে'ই সব জানাই মনপত্র, মনালাপ দিয়ে। জানি 'সে' কখনো জানবে না, আমিও 'তাকে' বলতে পারব না অধিকার নিয়ে 'তোমাকে চাই'। শুধু জানি বেঁচে থাকা সুন্দর, জীবন আরো প্রার্থিত 'তাকে' ভাবতে পারছি বলে। তার কাছে আমার ঋণ আছে আমাকে এখনো প্রেমজ রাখছে বলে।

মনের ঘরে থাকুক স্বাধীন সন্তরণ। শুধু একদিন ভালোবাসা মৃত্যু যে তারপর তাও যদি হয়... প্রেমহীন হাজার বছর বেঁচে কী লাভ, তারচেয়ে এসো, হাঁটি পাশাপাশি, উল্লাস করি, হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করি নিজেকে আরেকবার "আমি 'ওকে' ভালোবাসি, আমাকে কখনো কি ভালোবাসবে 'ও'?"

➢ সমকাল
নারীস্থান
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭.

আমার ঘর কোথায়!

টিনের বাড়ি ছিল, টানা একটা রুম, রান্নাঘর, নামকাওয়াস্তে একটা ড্রইং রুম। আমাদের সংসার, সামনে উঠোন। ওই টানা রুমে আমরা সবাই। বড় হতে হতে মনে হতো আহা, আমার যদি একটা আস্ত রুম থাকত! একটা পড়ার টেবিল! খুব স্বপ্ন দেখতাম। বাবা-মায়ের অসম্ভব সততার মাইনেতে, মায়ের উদয়াস্ত পরিশ্রমে ঢাকায় থাকা আমাদের স্বপ্ন এটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা সুখী ছিলাম, জানতাম একদিন আমাদেরও হবে। হয়েছেও। মায়ের কর্মস্থল থেকে পাওয়া ঋণের টাকায় আমাদের বাড়ি হয়ে গেল। সবচেয়ে ভালো রুমটা ভাইরা আমাকে গুছিয়ে দিলো। আমার একটা পড়ার টেবিল হলো। সেই আট বছর, সেই রুম, আমার রুমের জানালায় চুমু দেওয়া বরই গাছ, বারান্দা, রুমভর্তি বই, আমার স্প্যানিশ গিটার, তবলা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, ডেক সেট, পিসি...আমার নিশ্চিন্তের গৃহকোণ। গভীর রাতে আমি আনন্দে বৃষ্টিতে ভিজেছি, জটিল জোছনায় বসে থেকেছি, খুব ভোরের আলো মেখেছি। সেই ক'টা বছর আমার ঘর ছিল, একার ঘর।

পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, বাড়ছে পরিবারের ডালপালা। জন্মের আগে থেকে যেখানে থাকতাম সে জায়গা থেকে আমরা চলে এলাম। দম বন্ধ করা একটা রুম পেলাম এ বাসায়। এসি আমার সেই বারান্দা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। মানিয়ে নিলাম। চার মাস লিখতে পারিনি। ধীরে ধীরে সয়ে গেল। সেই দমবন্ধ রুমেই দেড় বছরে লিখে ফেললাম আমার প্রথম বই।

দাদী ভীষণ অসুস্থ। আমার রুমটা থেকে ফ্ল্যাট কমোডের বাথরুমটা সবচেয়ে কাছে। রুম ছেড়ে দিলাম। আমি স্থানান্তরিত হলাম। সময়ে সয়ে গেল।

ভাইয়া বিদেশ থেকে চলে এলো। আমি আবার আমার পুরনো রুমে প্রত্যাবর্তিত। এর মাঝে দাদী সুস্থ হয়ে তার আপন আলয় গ্রামে ফিরে গেছেন। এবারের রুম বদল নির্বিকার মেনে নেই।

মেয়ের অনেকদিনের স্বপ্ন ছাদের আধখানাতে থাকবে। রাতে ছাদে হাঁটতে হাঁটতে লিখবে। বাবা-মা একমাত্র মেয়ের স্বপ্নকে আবার পূরণের প্রকল্প হাতে নেন। আমার জন্য ছাদের আধখানাতে রুম ওঠে। এবার মনে হয় আমার ঘর হবে। আহা ঘর আমার। আমি মন চাইলে নাচব, কারো অসুবিধা না করে সারারাত বই পড়ব, জীবনানন্দের বিষণ্নতাকে রাতভর মনে মনে আউড়াবো। আমি আমার হবো, শুধুই আমার।

ছাদের আধখানা শেষ হওয়ার আগেই মেয়ের বিয়ে ঠিকঠাক। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে ছাদে থাকবে তাই বাবা-মা-ভাইরা যদ্দূর সম্ভব ফিটফাট করে তোলে ছাদের আধখানা। শ্বশুরবাড়ি ছাদের আধখানা দেখেই বলে ফেলে 'ওহ্, ঘরজামাই রাখার সব জোগাড়যন্ত্র সম্পন্ন!'। শ্বশুরবাড়ি যাই, মায়ের বাসায় থাকি। আমি আসলে কোথায় থাকি? আমার মনের ভেতর কোন ঘর? যাতায়াত, কর্মস্থল সব মিলিয়ে বর আর আমি আলাদা বাসা নেই। আমার কোথাও মন টেকে না। কোনো ঘরই আপন মনে হয় না। আমি ছাদের আধখানাতে যেদিন একা থাকি মনে হয়

এই তো আমার ঘর, এই যে সেলফ ভর্তি বই, এই যে পিসি, ওই যে প্রিয় কলম, সাদা কাগজ বুক পেতে আছে আমার স্পর্শের আশায় এই তো আমার ঘর। আমার বরের সঙ্গে যে নিবাস সেটা আমার কাছে সরাইখানার মতো লাগে। আমি কি বড় বেশি আত্মসর্বস্ব! সারাদিনের টানটান মার্কা চাকরির পর আম্মুর রান্না করা খাবার খেতে ভালো লাগে। সেদিন আমি ছাদের আধখানাতে জম্পেশ ঘুমোই। কারো সঙ্গে শয্যার ভগ্নাংশও ভাগ করতে আমার ভালো লাগে না। গান শুনতে শুনতে ঘুমাই না কতদিন, বই পড়তে পড়তে ভাবনার ঘুড়ি-নাটাইবিহীন সময় কাটাই না কতকাল! এবারের বইমেলায় কেনা একটা বইও পড়তে পারিনি এই প্রথমবারের মতো।

আমার কোনো ঘর নেই। 'তুই এখন কোথায়? জামাইর বাসায় না কি তোর আম্মার বাসায়?'

আমি কোথায়? আমি একটা ঘর নিদেনপক্ষে রুম খুঁজি। যেখানে আমি ছাড়া আর কারো উঁকি দেওয়ার অধিকার থাকবে না। সেখানে আমি অকারণ মন খারাপে কাঁদলে কেউ বারবার জিজ্ঞেস করবে না কী হয়েছে। আমার স্বাধীন মুক্ত হাসি না হোক কান্নার জন্য অন্তত বাথরুমে ঢুকতে হবে না।

মনের মাঝে ডুব দেই। মনের টানা বারান্দায় দিন শেষে চায়ের কাপ হাতে এ মাথা ও মাথা করি। নিজের মতো করে থাকা এটাই তো আসলে ঘরে থাকা। আমি হয়তো ঘর নয় আমাকেই খুঁজি, আর কে না জানে মানুষ যখন একা থাকে সেটাই তার আসল রূপ। ছাদের আধখানা আমার জন্য খোলা বাবার তরফে, কিছুই সরানো হয়নি; দোতলার সেই রুম এখনো আমার জিনিসেই ভরপুর। কিন্তু...এই কিন্তুর উত্তর আমার জানা নেই। আনমনে ভাবি, কবরটা তো অন্তত আমার একার হবে, কাউকে ভাগ দিতে হবে না– হবে তো শুধুই আমার?

➢ সমকাল
নারীস্থান
১ এপ্রিল, ২০০৭

একদিন সত্যের দিন...

ছুটছি সবাই, নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নেই– এমন ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটা আমাদের প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে খরচের অর্থে। এখন একক আয়ে সংসার চালানো সৎভাবে প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া শিক্ষিত সুস্থ মানুষ বাসায় বসে শুধু ঘরকন্যার কাজ করা অনেকটা সেই শিক্ষিত নারীর জন্য অবমাননাকরও হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পেশায় নারীরা আসছেন আগের চেয়ে বেশি। নারীরা কর্মক্ষেত্রে আসায় বাড়ির অনেকেই বুঝতে পারছেন আসলে নারীরা গৃহে এমন কিছু দায়িত্ব পালন করেন যা আর্থিক উন্নতিতে সহায়ক না হলেও হেলার বিষয় নয় মোটেই। গত ৩০ বছরে নারীর কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমন বেড়েছে সমস্যাও। তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাচ্চার প্রতিপালন। আমাদের যৌথ পারিবারিক কাঠামো নানা কারণে ভেঙে যাওয়াতে বাচ্চা কার কাছে রেখে কাজে আসা যায় তা একটা মাথাব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে কাজের মেয়ের দায়িত্বে বাচ্চা ছেড়ে আসাতে।

ঘটনা-১

সুমি বিয়ের পর থেকে শাশুড়ির সঙ্গেই থাকতেন। প্রথম বাচ্চাকে বড় করতে তার তেমন বেগ পেতে হয়নি। অফিসও করেছেন নিশ্চিন্তে। দ্বিতীয় বাচ্চা যখন হলো তখন সুমির শাশুড়ি মারা গেছেন। সুমিও বদলি হয়ে চলে এসেছেন ঢাকায়। ঢাকায় এসে বহু খোঁজাখুঁজির পর একটা পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েকে পেলেন। ভালো সবই ভালো। বছর পার হয়ে গেছে ভালো কাজের মেয়েকে দিয়ে। সুমির শরীর খারাপ হওয়াতে একদিন তাড়াতাড়ি বাসায় এলেন দুপুরবেলা। বাসায় কাজের মেয়েও নেই, সুমির বাচ্চাও নেই। বাসা তালা দেওয়া। সুমি বরের অফিসে ফোন করলেন তৎক্ষণাৎ। পাশের ফ্ল্যাটে জিজ্ঞেস করলেন দেখেছে কি-না। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা জানালেন, সুমি প্রতিদিনই এ সময় বেরিয়ে যায়। সুমির ছেলের স্কুল শেষ হয় তিনটায়, তিনটার একটু আগে কাজের মেয়ে চলে আসবে। কাজের মেয়ে এলো। সুমি বাচ্চাকে পেয়েই খুশি। কাজের মেয়ের গায়ে সুমির একদম নতুন জামাটা, পায়ে সুমির স্যান্ডেল, ভ্যানিটি ব্যাগ, চোখে সানগ্লাস; একে দেখে কে বলবে এ সুমির বাসায় কাজের মেয়ে! ফ্ল্যাট সংস্কৃতিতে সুমি কখনো পাশের ফ্ল্যাটে যাওয়ারও সময় পাননি, জানতে পারেননি এক বছর সুমির কাজের মেয়ে আসলে কি করেছে। কাজের মেয়ে ওই সময়টুকু বাচ্চা নিয়েই বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করে উপরি টাকা আয় করত।

ঘটনা-২

বাচ্চা দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। কালো হয়ে যাচ্ছে। তালাত আর রেবা দু'জনেই যারপরনাই সোহানের এমন হয়ে যাওয়াকে মেনে নিতে পারছেন না। অফিস থেকে ফিরেই রেবা যতদূর সম্ভব সোহানের যত্ন নেন। রেবার সংসার যেদিন

থেকে শুরু সেদিন থেকে মেয়েটাও আছে। সোহান সেই রওশনের কাছেই থাকে। রওশন তো সোহানের অযত্ন করার কথা নয়! রেবা তালাতকে বলে সে আর চাকরি করবে না। সোহান এক বছরের বাচ্চা হিসেবে আন্ডারওয়েট। দিনকে দিন কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে। এই পেট খারাপ তো কালকে জ্বর। বাচ্চাটা সন্ধ্যার পর থেকে শুধু ঘুমায়। কোনোভাবেই তোলা যায় না, ঘুমের মধ্যেই যতটুকু বুকের দুধ খাওয়া। এভাবে কী বাচ্চা বাঁচবে! তালাত রেবাকে ধৈর্য ধরতে বলে। রওশনকে পইপই করে বলে সোহানকে কখন কি খাওয়াবে। রওশন মাথা নাড়ে।

তালাত দুপুর বারোটার সময় তার ধানমন্ডির অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে একদিন। প্রচন্ড রোদ। মাথা ব্যথা। তালাত নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে। ধানমন্ডি সাতাশ নম্বরের ওখানে জ্যামে বসা গাড়ি নিয়ে। গাড়ির গ্লাসে একটা বাচ্চা অনবরত দু'হাতে বাড়ি দিচ্ছে মায়ের কোল থেকে, ভিক্ষার আশায়। তালাত বিরক্ত হয়ে একবার তাকায়। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়, সবুজ বাতি জ্বলার অপেক্ষা করে। ত্রিশ গজ গিয়ে তালাত গাড়ি রাস্তায় ফেলে আবার ছুটে আসে সেই মহিলার কাছে। মহিলার কোল থেকে বাচ্চা তালাতের কোলে ঝাঁপ দেয়। তালাতের সোহান ওই ভিখারিণীর কোলে কালিঝুলি মেখে খররোদে ভিক্ষা করছে। রওশন যে কি-না সোহান হওয়ার আগে থেকে রেবা-তালাতের সংসারে আছে সে প্রতিদিন দুই শ' টাকার বিনিময়ে সোহানকে ভাড়া খাটিয়েছে গত আট মাস।

সোহানের শরীরের তাই এই হাল।

রেবা সেই যে মানসিক আঘাত পেয়েছেন এখনো সামলে উঠতে পারেননি। সোহানকে এক মুহূর্তের জন্যও কাউকে ধরতে দেয় না। তালাত জানে না তালাতের কর্মচঞ্চল বউটা আদৌ এই আতঙ্ক থেকে বের হয়ে আসতে পারবে কি-না। সোহান তার বাবাকে চিনতে পারাতেই আট মাস পর তালাতরা এমন নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হয়েছে।

এমন ঘটনা আরো অন্তত এক শ'টা এ মুহূর্তে বলা যাবে। এর সমাধান কী? সুমি, রেবাদের চাকরি না করা? তালাত, সুমির বর কেউই কিন্তু তাদের বউদের চাকরি ছেড়ে দেওয়াকে এর সমাধান ভাবেননি। ভালো লাগার জায়গা এখানেই।

তালাতের খুব সহজ কথা– 'আমার বাবা-মা থাকেন দিনাজপুর। তাদের এখানে এসে নাতিকে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে একটা ডে-কেয়ার করতে কত টাকা লাগে? এত এত মুনাফা করে কোম্পানিগুলো কিন্তু এই মৌলিক একটা ব্যাপারকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না।'

সময় তো অনেক বদলেছে। আমরা এখন পশ্চিমা ঢঙে কর্পোরেট কালচার ফলো করি, পোশাক পরি, ফাস্টফুড খাই। পশ্চিমাদের ভালো কিছু নিতে পারি না! তাদের তো বাচ্চা রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার আছে। মায়েরা এক বছর মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছেন। এত অনিশ্চয়তার মাঝে কি বাচ্চা রেখে ঠিকভাবে কাজ করা যায়, না সম্ভব? তালাতের প্রস্তাব কি কোনো একটা আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা যায় না? আইনটা এমন হবে যে, কোনো প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার অবশ্যই থাকতে হবে।

আমরা অনেক পরিবর্তন দেখি, দেখছি। এই পজিটিভ পরিবর্তনটুকু দেখার আশা

কী আমরা করতে পারি?

➢ সমকাল
নারীস্থান
৮ এপ্রিল, ২০০৭

ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায়-আসে না

এগারো বছরের স্কুলজীবনে শেষ বছর অর্থাৎ নিউ টেনে ওঠার পর আমরা স্কুল থেকে একসঙ্গে কোথাও গেলাম টিচারদের তত্ত্বাবধানে। আমাদের এক শ' জনের মতো ছাত্রীকে পিকনিকে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাইরে। আমরা যারপরনাই উত্তেজিত, উচ্ছ্বসিত। সকাল ৭টার মধ্যে স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে। গন্তব্যস্থল কুমিল্লার কোর্টবাড়ি-ময়নামতি। ৭টার বাস সাড়ে ৮টায় ছাড়ল। প্রচুর মজা করতে করতে তিন বাসে আমরা গেলাম। ঢাকায় ফিরলাম রাত ৯টায়। বাথরুম চেপে রাখার সর্বোচ্চ রেকর্ড করলাম আমরা, আমাদের নাম কেন গিনেজ বুকে উঠল না– এ নিয়ে আমরা আজো বান্ধবীরা একসঙ্গে হলে হাসাহাসি করি। কষ্ট পেয়েছি অনেক যতই হাসি না কেন!

স্কুলে আমাদের ক্লাস হতো টিনের ঘরে। টিচার্স রুম পেরিয়ে টয়লেট। সাত মিনিটের পথ। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস, ওই স্কুলে কাটানো ৭ বছরের মধ্যে আমি সাতবারও বাথরুমে যাইনি। কারণ এই দূরত্ব। তাছাড়া টিচারদের পারমিশন নিয়ে বাথরুমে যাওয়ার ঝামেলার জন্য। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ।

আমার কলেজ ভিকারুননিসা নুন। শ্রদ্ধেয় হামিদা আলীর কথা আজো আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। উনি এসেম্বলিতে বলেছিলেন, 'মেয়েরা তোমাদের জন্য টাইলস দেওয়া নতুন বাথরুম করেছি, যাবে। এতক্ষণ কলেজে থাকো, বাথরুমে না গেলে ইউরিন ইনফেকশন হবে।' সেই ইনফেকশনে শত শত নারী প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে। কারণ বাথরুম না থাকা, নোংরা বাথরুম। ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতো জায়গায় কলাভবনে বাথরুম সুবিধা শুধু নিচতলায় আর চারতলায়। নিচতলায় চারটা আর চারতলায় দুটো টয়লেট। আমার কাছে অবাক লাগে এত হাজার স্কয়ার ফিটের এক একটি প্রতিষ্ঠান, বাথরুম করতে এত কার্পণ্য কেন?

বান্ধবীর বৌভাত, সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ভোরে রওনা করেছি, বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তবে আমাদের যাত্রা শুরু। দুপুরে ২টায় পৌঁছালাম, ছেলেরা দিব্যি রাস্তার পাশে বাস থামিয়ে টয়লেটের কাজ সেরে নিল, আমরা কয়জন মেয়ে যে এতক্ষণ ওদেরই সঙ্গী হয়ে বসে আছি বাসে একবারও ভাবল না আমাদের কথা।

ইন্ডিয়া গিয়েছি পনেরো দিনের শিক্ষা সফরে। দেখেছি পেট্রল পাম্পগুলোতে মোটামুটি ফ্রেশ হওয়ার সুব্যবস্থা। পাবলিক টয়লেটে পয়সা দিয়ে ঢুকেছি। মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা আছে। তারা ইচ্ছা করে বিস্মৃত হয়নি যে মেয়েদেরও বাথরুম পেতে পারে। মালয়েশিয়া গিয়েছি, তান্ডাস (টয়লেট) আছে নারীদের জন্য সমানভাবে।

বেসরকারি অফিসগুলোতে কী অবস্থা বাথরুম সুবিধার? নিজে এ পর্যন্ত তিন জায়গায় কাজ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। প্রথম অফিস তিন হাজার স্কয়ার ফিটের, মেয়েদের বাথরুম ছিল একটা, কোনোমতে একটা প্যান বসানো, বেসিন নেই, হ্যান্ড শাওয়ার নেই, টয়লেট পেপার যার যার ব্যক্তিগত । দ্বিতীয় অফিস পৌনে চার হাজার স্কয়ার ফিটের। তেরোজন ছেলের জন্য বাথরুম চারটা।

আঠারোজন মেয়ের জন্য একটা মাত্র বাথরুম, তাও কোনো ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা ছাড়া। সেই বাথরুমে যাওয়ার আগে আবার আপনাকে তিনবার ভাবতে হবে, কারণ ক্যাশ কাউন্টারের সামনে সেই বাথরুম, ক্লায়েন্টদের চোখের সামনে দিয়ে আপনাকে সেই বাথরুমে যেতে হবে। আমাদের তথাকথিত আধুনিক অফিস, দারুণ চাকচিক্য, লাখ টাকা দিয়ে ইন্টেরিয়র, কনস্ট্রাকশন কোটি টাকার এক এক স্থাপনার। এসি, দামি সোফা সেট। টেবিলে টেবিলে লেটেস্ট মডেলের পিসি। হাইফাই অবস্থা যাকে বলে! শুধু মেয়েদের বাথরুমে একটু বেশি জায়গা দিতে আমাদের দারুণ অনীহা। সাড়ে চার হাজার স্কয়ার ফিটের অফিসে তেরোজন মেয়ের জন্য আড়াই হাত বাই সোয়া তিন হাতের বাথরুম দেখেছি, যা সারাদিন স্যাঁতসেঁতে থাকে কারণ, উইদাউট ভেন্টিলেশন। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তেরোজনের গড়ে তিনবার করে ঊনচল্লিশবার বাথরুমে যেতে হয়, এই আমাদের পরিকল্পনার ধরন।

আমার এই লেখা পড়ে হয়তো অনেকেই ভাববেন মেয়েটা ভারি নির্লজ্জ, কিছু যায়-আসে না– বছরের পর বছর যা দেখছি তাই বললাম। আমি শুধু জানি আমাদের কথা কেউ ভাবে না, ঘরে না, বাইরে না। যে সহকর্মীদের সঙ্গে দিনের বারো ঘণ্টা কাটাই, সেই পুরুষ সহকর্মীরাও না। তাই আমার কথা আমাকেই বলতে হবে। তাই একটা হাইজেনিক, ভেন্টিলেশন আছে এমন বাথরুম অফিসে যেমন চাই তেমনি ব্যাপকহারে পাবলিক টয়লেট চাই নারীদের জন্য। আইন করা দরকার এত স্কয়ার ফিটের অফিসে এত মাপের বাথরুম রাখতে হবে, যেমন পার্কিংয়ের জন্য রাজউকের নকশায় অনুমোদন থাকে তেমনি। তাহলে যদি এ সমস্যার একটু সুরাহা হয়!

➢ সমকাল
নারীস্থান
২২ এপ্রিল, ২০০৭

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং
১.	আনন্দ গানে রে...	৯
২.	শীতচক্র	১০
৩.	বুকের জমিন জুড়ে শুধু বন্ধুদের বসতবাটি	১১
৪.	জোয়ান অফ বাংলাদেশ	১২
৫.	এইসব দিন-রাতপঞ্জি	১৪
৬.	দ্বিখন্ডিত দৈনন্দিন	১৫
৭.	ধর্ম = মনুষ্যত্ব',' সে আসিবে	১৭
৮.	ব্যক্তিগত শীত	১৮
৯.	নবীদা এখন ভীষণ ব্যস্ত	১৯
১০.	বন্ধু থাকো, আমার মনে...	২০
১১.	আত্মকথা	২১
১২.	সেই তারুণ্যের কথা বলতে এসেছি	২২
১৩.	বর্ষাপ্রেমিকের প্রতীক্ষায়	২৪
১৪.	ভালোবেসে চলে যেতে নেই	২৫
১৫.	শোনো বলি ইসাবেলা	২৭
১৬.	তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ	২৮
১৭.	অন্য এক স্বপ্নবাজি রাখছি আমরা বিজয়ে	২৯
১৮.	ভুলে যাওয়া মনে রাখা এবং বর্তমান	৩১
১৯.	পড়ালেখা শেষ হওয়ার আগেই বিয়ে, বিড়াল পার...	৩৪
২০.	গল্পের বদলে আংশিক জীবন	৩৬
২১.	কর্মজীবি নারী ও মাতৃত্ব	৪০
২২.	পুড়ি আমি আগুনে...	৪৩
২৩.	... ইচ্ছে করে মনের কথা কই	৪৫
২৪.	একা বসি সন্ধ্যা হলে, আপনি ভাসি নয়ন জলে...	৪৭
২৫.	উপহার যখন উপহাসের হাতিয়ার	৪৮
২৬.	তারপরও কেন এই ভোগান্তি?	৫০
২৭.	ফুটবল স্পিকস্	৫৩
২৮.	নারী কিংবা পুরুষ নয়, মানুষ করে তুলুন	৫৫
২৯.	ইসাবেলার নাইওরি	৫৭

ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং
৩০.	পঞ্চাশ পয়সার রাত!	৫৯
৩১.	আমি যে বহ্নিশিখা...	৬২
৩২.	'মা'কে আমার পড়ে যে মনে...	৬৫
৩৩	রাজনীতিতে নারী ও আমাদের আগামী	৬৮
৩৪.	এসো হাতে হাত ধরি, উল্লাস করি...	৭২
৩৫.	আমার ঘর কোথায়!	৭৪
৩৬.	একদিন সত্যের দিন...	৭৬
৩৭.	ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায়-আসে না	৭৯

আফসানা কিশোয়ার, জন্ম ঢাকাতে ১৯৭৮ সালের ৮মার্চ। ২০০০ সালে লেখালেখির শুরু 'যায়যায়দিন' এর মাধ্যমে। তারপর 'প্রথম আলো' র সেরা ফিচার লেখকের স্বীকৃতি। এরপর আর পেছন ফেরা নয়। প্রথম শ্রেণীর বেশ ক'টি দৈনিকের নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। দেশের ভেতর, বাহির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার লেখা ছাপা হচ্ছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের প্রথম কাব্যোপন্যাস 'রোজনামচা : ভালোবাসা', অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও শব্দচয়ন এই কাব্যোপন্যাসকে দান করে ভিন্নমাত্রা। পদ্য, লেখকের অন্যতম প্রিয় বিষয় হলেও গদ্যে তিনি সমান সাবলীল। 'নস্টালজিয়া' ও 'ত্রৈরাশিক' এই দুই গল্পগ্রন্থে তিনি তার সেই পারদর্শীতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ২০০৫ ছিল লেখকের জন্যে স্মরণীয় বছর। এবছর 'শব্দোৎসব', ৬০টি কবিতার একটি দীর্ঘ স্যিকুয়েল, নান্দনিক অলংকরণসহ প্রকাশিত হয় এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ২০০৫ এ-ই বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের উপর লেখা লেখকের 'প্রবাসের খেরো কবিতা' র প্রকাশ ও ভিডিওচিত্র নির্মাণ করে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'টেনাগানিটা'। ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় কবি আফসানা কিশোয়ারের "পাল্টায় নারী, বাহারি" কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় অন্যপ্রকাশ থেকে। লেখক বর্তমানে একটি বিদেশী ব্যাংকে কর্মরত।

লেখকের প্রকাশিত বই :

পাল্টায় নারী, বাহারি	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৭	অন্যপ্রকাশ
পাখি ও সম্রাজ্ঞী	গল্পসংকলন একুশে বইমেলা ২০০৭	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
ত্রৈরাশিক	বড়গল্প একুশে বইমেলা ২০০৫	কারসাফ
শব্দোৎসব	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নস্টালজিয়া	ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নিষিদ্ধ ইশতেহার	অণুকাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
রোজনামচা : ভালোবাসা	কাব্যোপন্যাস মে ২০০৪	শিখা প্রকাশনী

তরুণরা না কি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ততো আগ্রহী নয় যত আগ্রহী নিজেকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই কি! আফসানার এই ফিচার এবং কলাম সংকলন পড়লে কে বলবে এই তরুণ সমাজ সচেতন নয়! তার পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়!

প্রথম ফিচার ২০০০ সালের অক্টোবরে লিখা। নিখাদ জীবনের কথা বলা, মাতৃত্বের আর্তি। সময় বয়ে যাচ্ছে, প্রাত্যহিকতার আশা আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া না পাওযা, সামাজিক বঞ্চনা এসব যেমন আছে আফসানা কিশোয়ারের ফিচার, কলামের উপজীব্য হিসেবে, তেমনি প্রেম, মানবিকতা, স্বপ্ন কোনটিই বাদ যায়নি তার আলোচনা থেকে। আছে সময়ের চলমান জার্নাল সেই ২০০০ সাল থেকে ২০০৭ এর এপ্রিল পর্যন্ত।

এই প্রজন্মকে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি অতি বাস্তব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে দেখি এবং প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণের হাতটি শক্তিশালী মনে হয় তখন আমাদের আশাবাদ পায় একটি ভিন্নমাত্রা।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সেলিনা পারভীন, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ভাগিরথী কে আফসানা যে আবেগে আমাদের সামনে তুলে ধরেন তখন আমাদের স্বপ্ন দেখতে আর বাঁধা থাকে না যে আমাদের সামনের বাংলাদেশ খুব খারাপ কোনো ভবিষ্যতের দিকে আসলেই ধাবিত হচ্ছে না।

বাস্তব, মানুষের স্বপ্ন, এসবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া এই দেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার বিপন্নতা-ইভটিজিং, বালিকাদের আত্মহননের মতো জঘন্য চালচিত্র। এরই মাঝে ইসাবেলা যে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখে অন্য এক বিজয়ে তারই সংকলন আফসানা কিশোয়ারের অষ্টম গ্রন্থ **'ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায়-আসে না'**।

ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায়-আসে না

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

নারী,
নারী
এবং
নারী

ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায়-আসে না

আফসানা কিশোয়ার